কংগ্রেস ও বাঙ্গালা

(শত বর্ষের রাজনীতিক ইতিহাস)



শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

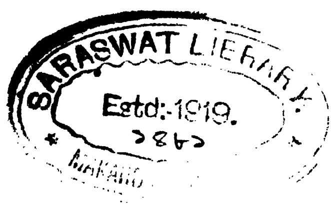
সংহতি কার্য্যালয়

৭নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা

মূল্য ১॥০ টাকা

প্রকাশক—
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী

মুদ্রাকর—
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী
অজন্তা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা



"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি,
মন্দিরে মন্দিরে।"

যে চিন্ময়ী জননীকে মৃন্ময়ীরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া পূজা করি—তাঁহারই উদ্দেশে ভক্ত সন্তানের ভক্তির অর্ঘ্য।

ভূমিকা ।

—):*:(—

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ব বৃক্ষের বীজে তিক্ত নিম্বই জন্মে—মাকালের বীজে মাকালই ফলে। যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না—চেষ্টা করে না—চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।"

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পঠিত সাহিত্যগুরুর এই উক্তি নানা উপলক্ষে গত পঞ্চাশ বৎসরে বহু বার স্মরণ করিয়াছি। গত ১৭ বৎসর রাজনৈতিক কারণে এই কথার যাথার্থ্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। ইংরাজ ঐতিহাসিকরা এ দেশের বিজিত অধিবাসীদিগকে অসার; দুর্ব্বল ও গৌরবশূন্য প্রতিপন্ন করিতে কখন কুণ্ঠানুভব করেন নাই। আমরা বিদ্রূপ করিয়া বলিয়া থাকি, তাঁহাদিগের মতে ক্লাইবের সময় হইতে ভারতের ইতিহাসের আরম্ভ। কিন্তু যখন বিদেশী বিজেতৃগণের নিন্দা করি—তখন কি বাঙ্গালী আমরা অন্যান্য প্রদেশের ব্যবহারের বিষয় স্মরণ করি? অন্যান্য প্রদেশের চেষ্টায় বাঙ্গালা আজ কংগ্রেসের মত জাতীয় প্রতিষ্ঠানে অবজ্ঞাত। তাঁহাদিগের কাহারও কাহারও কথায় মনে হয়—ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনের আরম্ভ—১৯২০ খৃষ্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলন হইতে!

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বহুবর্ষ পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালা—যে বাঙ্গালা এক দিন অনাচার-মুক্তির জন্য রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল সেই বাঙ্গালা—যে রাজনীতিক আন্দোলন করিয়া আসিয়াছে, তাহারই ফলে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল বলিলে অযথা গর্ব্ব করা হয় না। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির সন্ধানে ভারতের রাজনীতিকদিগকে এই বাঙ্গালায় আসিতে হইয়াছিল এবং বাঙ্গালাই বহুদিন কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল।

কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠা যেমন বাঙ্গালীর দেশাত্মবোধানুশীলনফলে সহজসাধ্য হইয়াছিল—বঙ্গ-বিভাগ উপলক্ষ করিয়া তেমনই বাঙ্গালা সমগ্র ভারতবর্ষে দেশাত্মবোধের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিল। নব ভারত রচনায় বাঙ্গালার কৃতিত্ব অসাধারণ। অথচ বাঙ্গালীই আজ সে কথা ভুলিয়া যাইতেছে।

সেই জন্য কংগ্রেস উপলক্ষ করিয়া এ দেশে রাজনীতিক আন্দোলনের ইতিহাস ও তাহাতে বাঙ্গালীর কার্য্য বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

বিলাতে নিয়ম আছে, ঐতিহাসিকরা যে সময় রচনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ৭০ বৎসরের পররাষ্ট্র বিভাগীয় দলিলপত্র তাঁহাদিগের অনধিগম্য রাখা হয়। এ দেশে বিদেশী সরকারের কোন বিভাগের কাগজপত্রে ভারতবাসীর অধিকার অক্ষুণ্ণ নহে। আবার এ দেশের জল-বায়ু যেরূপ তাহাতে ব্যক্তিগত সংগ্রহের পুস্তকাদি অনেক সময় সামান্য অযত্নে নষ্ট হইয়া যায়। সার উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার যথার্থই বলিয়াছেন—"The faint smell of damp volumes and decaying binding * * is the true odour of literature in Bengal."

বাঙ্গালার অধিবাসীরা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান জন্য কৃতজ্ঞতাবশে মেটকাফের স্মৃতিরক্ষার্থ যে সৌধ রচনা করাইয়াছিলেন, তাহা পুস্তকাগাররূপে ব্যবহৃত হইত। সে গৃহ এখন সরকারের অধিকৃত—পুস্তক-সংগ্রহ সরকারের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী-ভুক্ত।

এই সকল বিবেচনা করিয়া যথাসাধ্য যত্নে ভারতের রাজনীতিক আন্দোলন ও তাহাতে বাঙ্গালীর অংশ সম্বন্ধে সংগৃহীত উপকরণের সাহায্যে এই পুস্তক রচনা করিলাম। ভবিষ্যতে ইহা উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের অনেক "গোপনীয়" চিহ্নিত পুস্তিকা ও পত্র আমি শ্রদ্ধেয় রাধারমণ কর মহাশয়ের স্নেহে পাইয়াছিলাম। তাহার পর আপনি যথাসম্ভব চেষ্টায় আরও পুস্তিকাদি সংগ্রহ করিয়াছি। সংগ্রহ যে অসম্পূর্ণ তাহা আমি যত অনুভব করিয়াছি, তত, বোধ হয়, আর কেহই অনুভব করেন নাই। একখানি চিত্রেও ভুল হইয়াছে। কিন্তু আর কয় বৎসর পরে এ সবও রক্ষা করা দুষ্কর হইবে। আমারও জীবনের অপরাহ্ণ উপস্থিত।

কংগ্রেসের বয়স ৫০ বৎসর পূর্ণ হইল। এই উপলক্ষে দেশবাসীর মনোযোগ দেশের রাজনীতিক অবস্থা-ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। কংগ্রেসে ও রাজনীতিক আন্দোলনে যাঁহাদিগের সহিত নানাভাবে—কখন সদ্ভাবে—কখন বিবাদে—কায করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাঁহারাও অনেকে আজ লোকান্তরিত। আজ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ, জানকীনাথ ঘোষাল, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বৈকুণ্ঠ-নাথ সেন, আশুতোষ চৌধুরী, যোগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু প্রভৃতির স্মৃতি আমাকে ব্যথিত করিতেছে। আমি তাঁহাদিগের নিকট অবারিত স্নেহ পাইয়া ধন্য হইয়াছি। বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন কালের সহকর্ম্মী বিপিনচন্দ্র পাল, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি আজ আর জীবিত নাই। প্রিয় সুহৃদ্ অরবিন্দ ঘোষ আজ ভিন্ন পথের পথিক হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনা যে তাঁহার দেশপ্রেমকে ম্লান করিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। এই পুস্তক রচনাকালে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক অনেকের কথা মনে উদিত

হইয়াছে। অনেক সময় ইচ্ছা হইয়াছে, তাঁহাদিগের সম্বন্ধীয় স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের বৈশিষ্ট্য বুঝাইবার চেষ্টা করিব; কিন্তু তাহা সম্ভব হইবে কি না বলিতে পারি না।

যাঁহারা এই পুস্তকের জন্য দুষ্প্রাপ্য চিত্র ও পুস্তিকা প্রদান করিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ আমি এই স্থানে স্বীকার করিতেছি। তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, আমার শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ সুকবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ দ্বিপেন্দ্র—ইঁহাদিগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্নেহ ভাজন শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও আয়োজন ব্যতীত এই পুস্তকরচনার কল্পনা কতদিনে কার্য্যে পরিণত হইত, বলা যায় না।

কংগ্রেসের ইতিহাস স্বতন্ত্র পুস্তকে লিখিয়াছি। এই পুস্তকে সেই ইতিহাস যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

গত শত বৎসরের রাজনীতিক ইতিহাস নানা প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। সে সব প্রভাবের বিবরণ প্রদান করা, এই পুস্তকে সম্ভব নহে। যদি এই পুস্তক পাঠ করিয়া কাহারও সেই বিবরণ প্রদান করিয়া বিস্তৃত ইতিহাস রচনায় আগ্রহ জন্মে, তবে আমি আমার চেষ্টা সার্থক হইয়াছে, মনে করিব।

কবি বায়রণের কবিতার কথা উদ্ধৃত করিয়া বাঙ্গালী পাঠকদিগকে এই পুস্তক উপহার দিলাম :—

"What is writ, is writ,—
Would it were worthier."

শিবরাত্রি,
৮ই ফাল্গুন, ১৩৩২

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ



শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বর্ণানুক্রমিক চিত্র-সূচী

ও

ক

গ

চ

জ

ট

ত

দ

ন

শ

স

হ

কংগ্রেস ও বাঙ্গালা

—(:০:)—

সূচনা

কংগ্রেসের বয়স অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ণ হইল। ভারতের এই অর্দ্ধশতাব্দীর রাজনীতিক ইতিহাস কংগ্রেসের ইতিহাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ দেশের রাজনীতি প্রজানীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না; কেন না, ইংরাজ পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে এ দেশ জয় করিয়াছে এবং এ দেশের শাসন ইংরাজ শাসন। প্রথমে এই শাসনের সহিত এ দেশের লোকের শাসিত হওয়া ব্যতীত অন্য কোন সম্বন্ধ ছিল না অর্থাৎ স্বৈর শাসনে প্রজার মতামতের কোন গুরুত্ব ছিল না। লর্ড মেকলে কল্পনাবিমানে আরোহী হইয়া মনে করিয়াছিলেন বটে, সুশাসনের ফলে এ দেশের অধিবাসীরা এক দিন আরও সুশাসনের স্পৃহা মনে পোষণ করিতে পারে; কিন্তু এ দেশে স্বায়ত্ত-শাসন স্থাপনের কথা তাঁহার মনে উদিত হয় নাই এবং সুশাসন যে স্বায়ত্ত-শাসনের স্থান লাভ করিতে পারে না, ইহা গণতন্ত্রপ্রধান দেশের অধিবাসী হইয়াও তখন তিনি মনে করিতে পারেন নাই। বোধ হয়, ইংরাজের এই দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতার প্রতি কটাক্ষ করিয়াই লাবুসিয়ার বলিয়াছেন, ইংরাজ স্বদেশে যে অধিকার সম্ভোগ করে, অন্য কোন জাতির পক্ষে সেই অধিকার লাভের স্পৃহা অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করে। তিনি যে আয়ার্ল-

ণ্ডের কথায় এই উক্তি করিয়াছিলেন, সেই আয়ার্লণ্ডের ইতিহাসের আলোচনা করিলে উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়। সে ইতিহাস কেবল অশ্রুসিক্তই নহে, পরন্তু রক্তসিক্তও বটে—এক দিকে আইরিশরা স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার লাভপ্রচেষ্টায় বদ্ধপরিকর হইয়া হিংসানীতিও অবলম্বন করিয়াছে—অপর দিকে উগ্রতর হিংসানীতি অবলম্বন করিয়া ইংরাজ শাসকরা সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সংগ্রাম দীর্ঘকাল-স্থায়ী হইয়াছিল—আজও আমরা সেই রণের অস্ত্রঝঞ্ঝনার শব্দ শুনিতে পাইতেছি।

মার্কিণকেও ইংরাজ রাজনীতিকরা স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারে বঞ্চিত রাখিবার চেষ্টায় সে দেশে বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন এবং সেই বিপ্লবেই মার্কিণ স্বাধীনতা অর্জ্জন করে। ইংরাজের উপনিবেশগুলি যে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার লাভ করিয়াছে, সে-ও অনেক চেষ্টায়।

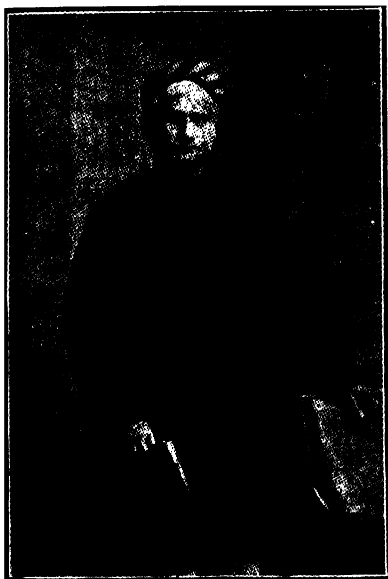
আইরিশ, আমেরিকান, কানাডিয়ান, অষ্ট্রেলিয়ান—সকলেই শ্বেতাঙ্গ, ইংরাজের জ্ঞাতি। যখন তাহাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদানেই ইংরাজের এত আপত্তি ছিল, তখন ভারতবাসীকে সে অধিকার প্রদানে ইংরাজের আপত্তিতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। কাযেই ইংরাজ পূর্ব্বে এ দেশে স্বৈর শাসন বা আমলাতন্ত্র শাসনই দেশবাসীর উপযোগী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে; আপনার শ্রেষ্ঠত্বগর্ব্বে মনে ভাবে নাই, এ দেশের লোককে স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান না করিলে দেশে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইবে। স্বরাজে দেশের লোকের অধিকার যে জন্মগত—তাহা স্বীকৃত হয় নাই।

এমন কি এ দেশে যখন মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়, তখনও লর্ড মর্লি বলিয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টি ভবিষ্যতে যত দূর যায়, তাহার মধ্যে তিনি ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা লক্ষ্য করিতে পারেন না।

আবার এ দেশের বিস্তার, জনসংখ্যা, নানা সম্প্রদায়ের অবস্থিতি ও বহু লোকের অজ্ঞতা—এ দেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার বিষম অন্তরায় বলিয়া বিবেচিত ও উপস্থাপিত হইত। জলে না নামিয়া লোক সন্তরণ শিক্ষা করিতে পারে না—অথচ ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদান না করিয়াই তাহাকে স্বায়ত্ত-শাসনের অযোগ্য বলিয়া সে অধিকারে বঞ্চিত রাখা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইত! এ দেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত করিলেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে সংগ্রাম হইবে—ইহা লর্ড মর্লি'র মত রাজনীতিকও অনায়াসে বলিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যখন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন যিনি এই প্রতিষ্ঠানের কল্পনাকে মূর্ত্তি দানে অগ্রণী হইয়াছিলেন, সেই মিষ্টার হিউম স্বয়ং এ দেশে সিভিল সার্ভিসে বড় চাকরীয়া ছিলেন এবং তিনি স্পষ্টই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, দেশের লোকের মনে যে অসন্তোষ সঞ্চিত হইতেছে, তাহা যদি বহির্গত হইবার পথ না পায়, তবে সঞ্চিত বাষ্প যেমন কলের বাষ্পাধার বিদীর্ণ করিতে পারে, শাসন-ব্যাপারে সেইরূপ ঘটিতে পারে। তাঁহার ইহা মনে করিবার কারণ ছিল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্ব্বে লর্ড রিপনের শাসনকালে বুঝা গিয়াছিল, এ দেশের লোক আপনাদিগের অধিকার লাভ করিতে চাহিতেছে এবং তাহা না পাইলে অসন্তুষ্ট হইতেছে। লর্ড রিপনের শাসনকালে এ দেশের এক শ্রেণীর বিচারককে ইংরাজ আসামীদিগের বিচার-ভার প্রদান করিবার প্রস্তাবে এ দেশে ইংরাজরা যেমন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এ দেশের লোক তেমনই সেই সঙ্গত অধিকারে বঞ্চিত হইয়া বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। সেই বিক্ষোভের পরিচয় বাঙ্গালায় যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, আর কোন প্রদেশে সে ভাবে করে নাই। তাহার কারণ, বাঙ্গালাই তখন দেশাত্মবোধে ভারতে অগ্রণী। ইংরাজ বক্তারা যেমন অশিষ্ট হইয়াছিলেন, বাঙ্গালী বক্তারাও তেমনই তাঁহাদি-

গের উক্তির প্রত্যুক্তি করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দানও করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঢাকায় লালমোহন ঘোষের জ্বালাময়ী বক্তৃতার উল্লেখ করিতে পারা যায়। যে ব্যারিষ্টার ব্রানসন এ দেশের লোককে অশিষ্টভাবে গালি দিয়াছিলেন, বাঙ্গালী এটর্ণীরা তাঁহাকে মামলায় ব্যবহারাজীব নিযুক্ত করিতে অস্বীকার করায় তাঁহাকে এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল। "বয়কট" বা বর্জ্জন তখন এমনই প্রবল হইয়াছিল।

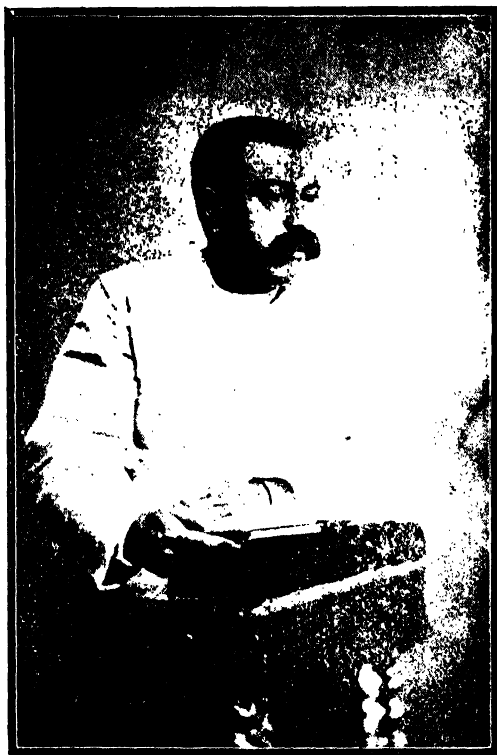


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালা সাহিত্যে সেই বিক্ষোভের পরিচয় রহিয়াছে। যে বঙ্কিমচন্দ্র "বন্দে মাতরম" মন্ত্রের মন্ত্রদ্রষ্টা তিনি যেমন, কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তেমনই ব্যঙ্গ রচনায় সেই বিক্ষোভ-পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। যে বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮০ বঙ্গাব্দে সাম্যবাদের তূর্য্যনিনাদ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"ঐ যে Jack Light-finger ভগ্নাবশেষমাত্র ষ্ট্র-হ্যাট মাথায় দিয়া, অনাবৃত পদে যাইতেছে, ও আরও বড় লোক; তোমার জন্য এক আইন, উহার জন্য আর এক আইন"—

তিনিই "ইলবার্ট বিল সম্বন্ধীয় বিবাদ-কালে" Bransonism লিখিয়াছিলেন। কৌতূহলী পাঠক 'লোকরহস্য' গ্রন্থে তাহা অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাইবেন।



হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আর হেমচন্দ্র সেই সময় "নেভার—নেভার!!" কবিতা রচনা করিয়াছিলেন:—

"গেল রাজ্য, গেল মান,
ডাকিল 'ইংলিশম্যান';

ডাক ছাড়ে ব্রানসন,—
কেশুয়িক, মিলার—
নেটিবের কাছে খাড়া—নেভার—নেভার !
নেভার সে অপমান—
হতমান বিবিজান
নেটিবে পাবে সন্মান
আমাদের জানানা !
বিবিজান, দেহে প্রাণ
কখনো তা' হ'বে না।
হিপ হিপ হিপ হুরে
হ্যাট কোট বুট প'রে
সরা ভাবে জগতেরে
তা'দের বিচার,
নেটিবের কাছে হ'বে
নেভার—নেভার ! !"

লর্ড রিপন যে ভারতবাসীকে বিশেষ অধিকার দিতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে ; তবুও, তিনি যে চেষ্টা করিয়াছিলেন সেই জন্য ভারতবাসীরা তাঁহাকে অশেষ সম্মান প্রদান করিয়াছিল। শুনা যায়, এক দল ইংরাজ লাটপ্রাসাদের রক্ষীদিগকে পরাভূত করিয়া বড় লাটকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক ইংলণ্ডগামী জাহাজে তুলিয়া দিবার পরামর্শ করিয়াছিল। সে কথা বাকল্যাণ্ড তাঁহার 'ছোটলাটের আমলে বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিলেও কেহ কেহ তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ট্রেণে যাইবার সময় তিনি যে কোন কোন ষ্টেশনে ইংরাজদিগের দ্বারা অপমানিত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা অবগত আছি। এক দিকে স্বাধিকারপ্রমত্ত দম্ভী ইংরাজদিগের এই ব্যবহার ; আর এক দিকে বিদায়কালে বেলগেছিয়ার বাগানে ভারতীয়দিগের দ্বারা লর্ড রিপনের সম্বর্দ্ধনা এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে (বর্ত্তমান যুক্ত প্রদেশ) সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা তাঁহার তাঞ্জাম

বহন—ইহার প্রকৃত অর্থ ও ইহাতে নিহিত সঙ্ঘর্ষ-সম্ভাবনা মিষ্টার হিউম লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বেলগেছিয়ার বাগানে ভারতীয়দিগের পক্ষ হইতে সম্মিলনে লর্ড রিপনকে সম্বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। তাহারও পূর্ব্বে কবি মনোমোহন বসু সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন :—



মনোমোহন বসু

"রিপণের, গুণের কথা
রইল গাঁথা
জন্মের মত হৃদ্‌মাঝারে।"

লর্ড রিপনকে যখন ভারতীয়দিগের পক্ষ হইতে শোভাযাত্রা করিয়া শিয়ালদহ রেল ষ্টেশন হইতে লাটপ্রাসাদে লইয়া যাওয়া হয়; সেই সময়

মহারাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের অনুরোধে এই গান রচিত হয়। ইহাতে ইলবার্ট বিলের কথা এইরূপে উল্লেখ করা হইয়াছিল ঃ—

"ইলবার্ট বিলের ছলে দুষ্টদলে
কষ্ট দিলে অবিচারে।
তাদের সেই পশুবৃত্তি অপকীর্ত্তি
নিত্য ভারত দগ্ধ করে।
নীচ লোকের কটুবচন মহৎ যে জন
কভু কি তা' গ্রাহ্য করে?
ভারতের হিতের তরে সহ্য ক'রে
দেখালেন গুণ চরাচরে।"

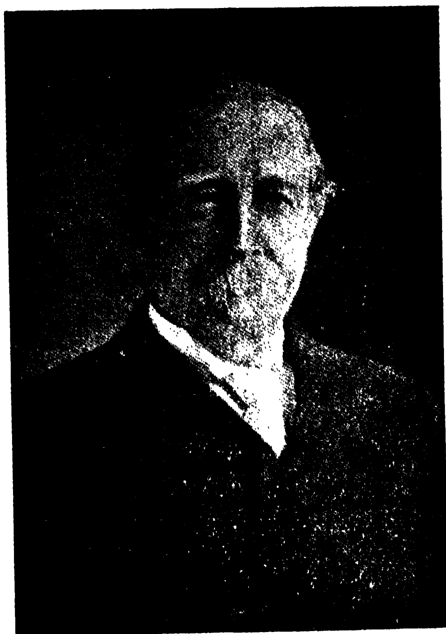
এই যে এক দিকে ভারত-প্রবাসী ইংরাজদিগের অতিরিক্ত অধিকার সম্ভোগের আগ্রহ, আর এক দিকে ভারতবাসীর তাহাতে আপত্তি—ইহাতে ভবিষ্যতে কি কুফল ফলিতে পারে তাহা বুঝিয়াই মিষ্টার হিউম কংগ্রেসের কল্পনা করেন। কিন্তু ইহার রাজনীতিক রূপও পরে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল এবং যখন নির্দ্ধারিত হয়, তখন মিষ্টার হিউমই বলিয়াছিলেন—ইহা এ দেশে ইংরাজ শাসনের safety-valve রূপে কার্য্য করিবে।

কংগ্রেসের ইতিহাস অধ্যয়ন করিলেই বুঝিতে পারা যায়—ইহার উদ্দেশ্য ও আদর্শ ভারতবাসীর নবোন্মেষিত দেশাত্মবোধ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

মিষ্টার হিউমের কল্পনা যে সহজেই এ দেশে গৃহীত হইয়াছিল, তিনি যে বীজ বপন করিয়াছিলেন তাহা যে অল্পকালমধ্যেই ভারতের ন্যগ্রোধের মত বিততশতশাখ বৃহৎ বনস্পতিতে পরিণত হইয়াছিল, তাহার কারণ ছিল। এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠান এক জনের বা এক দিনের চেষ্টায়

প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। তাহার জন্য উপযুক্ত পরিবেষ্টনের প্রয়োজন হয়। কংগ্রেস যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সেই পরিবেষ্টনও সৃষ্ট হইয়াছে এবং সেই পরিবেষ্টন সৃষ্টির গৌরব প্রথমে বাঙ্গালার প্রাপ্য।

দেশবাৎসল্যের কথায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—



মিষ্টার হিউম্

"এ ধর্ম্ম অনেক দিন হইতে বাঙ্গালা দেশে ছিল না কখনও ছিল কি না বলিতে পারি না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছে দেখিয়া আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি বা আপন আপন ধর্ম্মকে ভালবাসিত। ইহা দেশবাৎসল্যের ন্যায় নহে—অনেক নিকৃষ্ট। মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী। ঈশ্বর গুপ্তের

দেশবাৎসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও তাঁহাদের অপেক্ষাও তীব্র ও বিশুদ্ধ। নিম্ন কয় ছত্র পদ্য, ভরষা করি, সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন :—

'ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥"

নানা দেশে কবিরা দেশপ্রেমের কথা বলিয়াছেন। স্বদেশ সম্বন্ধে মানুষের মনোভাব গোল্ডস্মিথ নিম্নলিখিতরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"Such is the patriot's boast, where'er we roam
His first, best country ever is at home."

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় প্রকাশিত ভাবের পার্শ্বে এই ভাব কি ম্লান বোধ হয় না ?

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিলে রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। তাহার কারণ, রামমোহন যেমন দেশবৎসল তাঁহার সমসাময়িক আরও অনেকে তাহাই ছিলেন ; আর রামগোপাল ও হরিশ্চন্দ্র দেশবাৎসল্যের প্রচারক—প্রথমোক্ত বক্তা, দ্বিতীয়োক্ত সাংবাদিক। উভয়েরই দেশবাৎসল্য সম্পূর্ণরূপে ইংরাজী শিক্ষার ফল না হইলেও তাহার প্রভাবে পুষ্ট। উভয়েই কেবল বাঙ্গলায় নহে—সমগ্র ভারতে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা—তাঁহারাই প্রথমে ভারতবর্ষকে এক দেশ ও ভারতবাসীকে এক জাতি কল্পনা করিয়াছিলেন। সে বিষয়ে রাজা রাজেন্দ্রলালের যে উক্তি কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে উক্ত হইয়াছিল তাহা পরবর্ত্তী। হরিশ্চন্দ্রের প্রবর্ত্তিত পত্র 'হিন্দু পেট্রিয়টের' পরবর্ত্তী সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল যখন

এ দেশে স্বায়ত্ত-শাসনের কথা বলিয়াছিলেন, তখন তাহা একান্তই নূতন; মিসেস্ বেসাণ্ট-প্রবর্ত্তিত হোমরুল আন্দোলন কৃষ্ণদাসের উক্তির প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরের।

যাহা বলা হইল, তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই তাহার প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত পরিবেষ্টন সৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়াছিল, আর বাঙ্গালায় তাহার আরম্ভ। কংগ্রেস এক দিনের এক জনের চেষ্টার ফল নহে।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই কেন সেরূপ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং কেনই বা তাহার কল্পনা, অন্ততঃ বাঙ্গালায়, মূর্ত্তি গ্রহণ করে নাই, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়। বাঙ্গালার ইতিহাস ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিবেন, তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন, বাঙ্গালা সাহিত্য বহুদিন পূর্ব্বেই স্বদেশবাৎসল্যের ভাবে ওতঃপ্রোতঃ ছিল। কবি, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, বক্তা দেশবাৎসল্যের ভাব প্রকাশ করিতেন। তাই ওমর খৈয়মের ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে কৌতূহল জন্মে, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব হইয়াছিল কেন?—

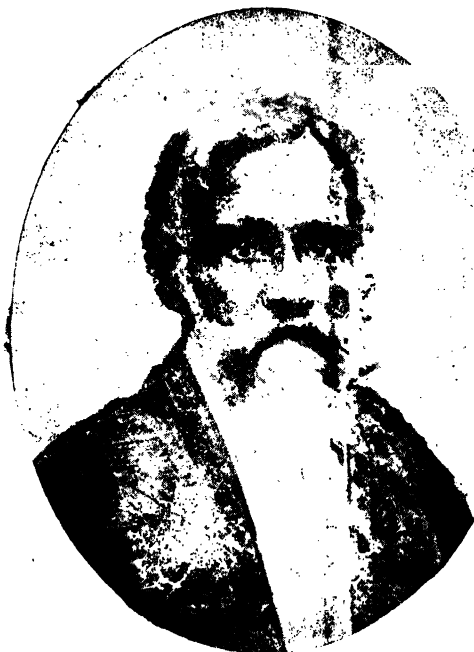
"When all the Temple is prepared within,
Why nods the drowsy Worshipper outside?"

এই যে নূতন জাতীয় ভাব ইহাতে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য সপ্রকাশ।

প্রথম বৈশিষ্ট্য প্রাদেশিকতা বর্জ্জন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার দ্বাদশ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে 'বঙ্গদর্শনে' "পত্র সূচনায়" বঙ্কিমচন্দ্র যখন বলিয়াছিলেন—"যত দিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, তত দিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই"—তখনই সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছিলেন:—

"এমন অনেক কথা আছে যে তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে; সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সে সকল কথা ইংরাজীতে

না বলিলে, সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম, কেবল ইংরাজীর দ্বারা সাধনীয়; কেন না এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে, বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজী ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে।"



সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই প্রবন্ধ পুণর্মুদ্রিত করিবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, এখন কংগ্রেসের দ্বারা এই কায হইতেছে। ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি-বন্ধন যে সকলের কাম্য, তাহা এই উক্তিতে সপ্রকাশ।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেও এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

'মিলে সব ভারত-সন্তান
একতান মনঃপ্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী
শত খনি রত্নের নিধান।

হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।

রূপবতী সাধ্বী সতী ভারত-ললনা
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
শর্ম্মিষ্ঠা, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী পতিরতা
অতুলনা ভারত-ললনা।
হোক্ ভারতে জয়,
ইত্যাদি

বশিষ্ঠ, গৌতম, অত্রি মহামুনিগণ
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন।
বাল্মীকি, বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস,
কবিকুল ভারত-ভূষণ।
হোক্ ভারতের জয়,
ইত্যাদি।

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী,
অধীনতা আনিল রজনী;

সুগভীর সে তিমির ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দীনমণি !
হোক্ ভারতের জয়,
ইত্যাদি

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ
পৃথ্বীরাজ আদি বীরগণ ?
ভারতের ছিল সেতু যবনের ধূমকেতু,
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন ।
হোক্ ভারতের জয়,
ইত্যাদি

কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতোধর্ম্মস্ততো জয় ।
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?
হোক্ ভারতের জয়
ইত্যাদি ॥

এই গানেও সমগ্র ভারতের কথা ।

হেমচন্দ্রের "ভারত সঙ্গীতে"ও সেই সমগ্র ভারতের দুঃখে আক্ষেপ :-

"বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় ।"—

সমগ্র ভারতের অধিবাসীদিগকে উপদেশ :—

"যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু, উল্কাপাত, বজ্রশিখা ধ'রে
সঙ্কল্প সাধনে প্রবৃত্ত হও ।"

বাঙ্গলার যে নবাব সিরাজউদ্দৌলার তিনি প্রভূত নিন্দাবাদ করিয়াছেন, পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজের নিকট তাঁহারই পরাভবে নবীনচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্রকিরণ।
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি!
তুমি অস্তাচলে, দেব, করিলে গমন,
আসিবে ভারতে চির-বিষাদ-রজনী।
অধীনতা-অন্ধকারে চিরদিন তরে,
ডুবায়ে ভারতভূমি যেও না তপন।



নবীনচন্দ্র সেন

এইরূপে দেখান যায়, যে সময় খণ্ড ভারতকে মহা-ভারতে পরিণত করিবার বিলম্ব ছিল, তখনও বাঙ্গালায় সেই মহাভারতের কল্পনা আদৃত হইয়াছিল। এমন কি বাঙ্গালার কথাই বাঙ্গালার রাজনীতিক ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত অল্প আলোচিত হইয়াছে এবং সাহিত্যে সেই ভাবই পরিলক্ষিত হইয়াছে।

নবগোপাল মিত্র মহাশয় তাঁহার নানা প্রতিষ্ঠানে ও মাসিক পত্রে "ন্যাসনাল" শব্দ ব্যবহার করিতেন বলিয়া বাঙ্গালায় তাঁহাকে "ন্যাসানাল নবগোপাল' বলা হইত।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—বাঙ্গালার সংযম ও বাঙ্গালার কমনীয় ভাব। ইহা 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতেই সপ্রকাশ। এই গান এখন ভারতের জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হইয়াছে এবং বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ের প্রস্তাবে ইহা ছত্রপতি শিবাজীর সমাধি-তোরণেও উৎকীর্ণ হইয়াছে। ইহা কেবল বাঙ্গালীর রচনাই নহে, পরন্তু যে চিন্ময়ী মাতাকে বঙ্কিমচন্দ্র মৃণ্ময়ীরূপে ধ্যানমূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন, যাঁহাকে তিনি নবারুণকিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া হাসিতে দেখিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেই দেশমাতৃকার বন্দনাগান রচনা করিয়াছেন :—

"বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং
মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং
মাতরম।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্তকোটিকণ্ঠকলকলনিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।

বহুবলধারিণীং
নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং
মাতরম্।

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্
অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাম্
মাতরম্
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং
সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীম্
মাতরম্।"

এই বন্দনা বাঙ্গালার বটে; কিন্তু ইহার ভাব সমগ্র ভারতবর্ষের বলিয়াই ইহা সমগ্র ভারতের জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হইয়াছে। মা "দশপ্রহরণধারিণী" —কিন্তু তিনি আবার "কমলদলবিহারিণী"—তিনি "সুস্মিতা ও ভূষিতা"।

ইহার সহিত যদি আমরা ফরাসী দেশের প্রসিদ্ধ জাতীয় সঙ্গীতের তুলনা করি, তবে ইহাতে বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য সপ্রকাশ দেখা যাইবে। ফরাসী-দিগের জাতীয় সঙ্গীতে উগ্রতার অভিব্যক্তি—

"To arms Citizens ! Citizens to arms !
March on ! On let us march in battle array,
That the Earth may be drenched with enemy's blood."

'বন্দেমাতরমে' এইরূপ উগ্রতা নাই।

দেশের দুর্দ্দশা যে তৎকালীন বাঙ্গালী লেখকদিগের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় নাই, তাহা নহে। 'বঙ্গদর্শনে' অক্ষয়চন্দ্র সরকার "দশমহাবিদ্যা" প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, ভারত-মাতার এক্ষণে ধূমাবতীর দশা—

"ভারতমাতা এক্ষণে
বিমুক্তকুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা।
কাকধ্বজরথারূঢ়া বিলম্বিত * * * ॥
সূর্পহস্তাতিরুক্ষাক্ষা ধৃতহস্তবরান্বিতা।
প্রবৃদ্ধঘোণাতু ভৃশং কুটিলা কুটিলেক্ষণা ॥

"বিধবা ভারতের পেটে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই, রুক্ষকেশা, রুক্ষাক্ষা; দন্ত বিরল হইয়াছে; শোকে তাপে দৃষ্টি কুটিল হইয়াছে, যেন সকল আশ্রয় পরিচ্যুতা হইয়া পুরাতন ভগ্নযান রথে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন; হায়! সেই রথের উপরি কাক বসিতেছে। বড় কুলক্ষণ; ভয়ে ভারত কাঁপিতে-

ছেন, কাঁপিতে কাঁপিতে সেই কম্পিত হস্তে ভঙ্গী করিয়া বলিতেছেন 'আমায় রক্ষা কর, আমি দেবী এক্ষণে অনাথা, রক্ষা কর তোমার মঙ্গল হইবে।' উদ্ধত ইংরাজ শাসনকর্ত্তা! একবার স্থির-চিত্তে এই মূর্ত্তির ধ্যান কর।. এক বার চারি দিকে চাহিয়া দেখ। দেখ দেখি সোণার পুরী কি হইয়াছে? ভুবনেশ্বরী এখন পথের কাঙ্গালিনী হইয়াছেন।"

সুতরাং দুরবস্থার অনুভূতির অভাব ছিল না।

'আনন্দমঠে'ও আমরা তাহাই দেখিতে পাই। মহেন্দ্র ব্রহ্মচারী-প্রদর্শিত পথে এক কক্ষে যাইয়া দেখিলেন, "এক অপরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি।" ব্রহ্মচারী মা'র এই মূর্ত্তির পরিচয় দিলেন:—

"ইনি কুঞ্জর কেশরী প্রভৃতি বন্য পশুসকল পদতলে দলিত করিয়া, বন্য পশুর আবাসস্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বালঙ্কারপরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্কবর্ণাভা সকল ঐশ্বর্য্যশালিনী।"

মা—যা' ছিলেন, তাহা এই। আর মা কি হইয়াছেন?—

"কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্ব্বস্ব, এই জন্য নাগ্নিকা। আজি দেশের সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন।"

এই অনুভূতি প্রবল—আক্ষেপোক্তিরও অভাব নাই। অতীতের সহিত তুলনায় বর্ত্তমানে অবস্থা কি শোচনীয়! কিন্তু তথাপি বাঙ্গালী তাহার বৈশিষ্ট্য, স্থৈর্য্য ত্যাগ করে নাই। অক্ষয়চন্দ্র বলিয়াছেন, ভারত-বর্ষের দশ দশাই দশমহাবিদ্যা—ভারতমাতা মহালক্ষ্মীরূপে দেখা দিবেন:—

"সুবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ আসন অম্বুজ।
দুই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চরি ভুজ॥

চতুর্দ্দন্ত চরি শ্বেত বারণ হরিষে।
রত্নঘটে অভিষেকে অমৃত বরিষে॥

"ভারত মাতার যুগযুগান্তরের মলরাশি শ্বেতহস্তিগণ অমৃতবারিসিঞ্চনে বিধৌত করিয়া দিতেছে। ভারত মাতা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন; পদ্মাসনে পদ্মাসনা পদ্মহস্তে জগতে অভয় দান করিতেছেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র মাতার ভবিষ্যৎ রূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"দশ ভুজ দশদিকে প্রসারিত,—তাহাতে নানা অয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দিগভূজা—নানাপ্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িণী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধরূপী গণেশ।"

মা'র আয়ুধের অভাব নাই—মা বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠ-বিহারিণী, কিন্তু মা যেমন বাহুতে শক্তি, তেমনই অন্তরে ভক্তি; তিনি যেমন দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা—তেমনই "কমলা কমলদল-বিহারিণী"—

"অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাম।"

শক্তির সঙ্গে সংযমের কি অপূর্ব্ব সম্মিলন!

ইহা কাপুরুষের বা শক্তিহীনের বৈশিষ্ট্য নহে—বীর ও শক্তিসম্পন্নের বৈশিষ্ট্য। কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয়-বর্ণনায় লিখিয়াছিলেন :—

"বাঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোত্থতান্।
নিচখাত জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ॥"

বাঙ্গালার রাজারা তখন রণতরী সজ্জিত করিয়া রঘুর সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্র লালের মাতৃস্তোত্র—

"একদা যাহার বিজয়-সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়;
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়"

—দৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালী যে একদিন মাৎস্যন্যায় দূর করিবার জন্য রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল, তাহাও যেমন ঐতিহাসিক সত্য, বাঙ্গালী যে উড়িষ্যার তালীবনশ্যাম নীলাম্বুবেলায়, গঙ্গাযমুনার সঙ্গমক্ষেত্র প্রয়াগে ও বারাণসীতে বিজয়-চিহ্ন রাখিয়া আসিয়াছিল, তাহাও তেমনই সত্য। কিন্তু বাঙ্গালী সে জয় অপেক্ষা ভাবরাজ্যের জয় অধিক মূল্যবান বলিয়া বিবেচনা করিয়া আসিয়াছে—বাঙ্গালার নাবিকরা যেমন উত্তুঙ্গ-তরঙ্গকুলসঙ্কুল নীলাম্বু উত্তীর্ণ হইয়া যাইয়া বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, তেমনই আবার তিব্বতে ও চীনে আপনার ধর্ম্মমত ও সভ্যতা প্রচারিত ও প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। বাঙ্গালা যত দিন মোগল ও পাঠানের আক্রমণ পরাভূত করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, ভারতের অন্যান্য অংশ ততদিন তাহা করিতে পারে নাই। আবার বাঙ্গালার লোকই মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম উভয়েই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। কিন্তু তখনও বাঙ্গালা ধর্ম্মবীরের প্রসূতি বলিয়াই গর্ব্বানুভব করিয়াছে। বাঙ্গালার গণতন্ত্রপ্রধান সমাজ সর্ব্বদাই আপনার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে। বিজয়-বন্যা ও আক্রমণকারী-দিগের প্লাবন বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিতে পারে নাই। বাঙ্গালার মনীষা তাহার ধর্ম্মে, সাহিত্যে ও শিল্পে আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। তাই বাঙ্গালা কখন সংযম হারায় নাই। এই যে সংযমের দৃষ্টান্ত, ইহা নীলকরদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী বাঙ্গালার প্রজার ব্যবহারেও পাওয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ—কিন্তু ভাবপ্রবণতা কখন তাহাকে সংযমভ্রষ্ট করে নাই—করিতে পারে নাই।

এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালীর স্বাবলম্বন ও তাহার গণতন্ত্রানুরাগের কথা উল্লেখ করিতে হয়। আপনার গৌরব রক্ষার জন্য অপরের সাহায্য প্রার্থনা বাঙ্গালীর আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করিত। "কমলাকান্ত" যখন জলতলগতা

মাতৃ-প্রতিমা তুলিয়া আনিয়া তাহার পূজা করিবার বলবতী বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার স্বদেশবাসী ভ্রাতৃবৃন্দকেই তাঁহার সঙ্গে একযোগে কায করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন—আর কাহারও সাহায্য গ্রহণের কথা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। তিনি রোদন করিয়াছিলেন, "উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্গজননী!" কিন্তু মা যখন কালসমুদ্র হইতে উঠিলেন না, তখন ব্যাকুল হইয়া "কমলাকান্ত" ডাকিলেনঃ—

"এস, ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার জলস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভূজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্রসকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে—চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে এই জলসমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া, আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?

বাঙ্গালী এ কাযে বাঙ্গালীকে—ভাইকে আহ্বান করিয়াছে। বাঙ্গালার লুপ্ত গৌরব স্মরণ করিয়া বাঙ্গালীর রোদন কি মর্ম্মস্পর্শীঃ—

"সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল; রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল; নগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল; কুঞ্জবনে পক্ষিগণ নীরব হইল; গৃহময়ূরকণ্ঠে অর্দ্ধব্যক্ত কেকার অপরার্দ্ধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পণ্যবীথিকার দীপমালা নিবিয়া গেল, পূজাগৃহে বাজাইবার সময়ে শঙ্খ বাজিল না; পণ্ডিতে অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল, সিংহাসন হইতে শালগ্রামশিলা গড়াইয়া পড়িল। যুবার সহসা বলক্ষয় হইল, যুবতী সহসা বৈধব্য আশঙ্কা করিয়া কাঁদিল; শিশু বিনারোগে মাতার ক্রোড়ে শুইয়া মরিল। গাঢ়-

তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে দিক্ ব্যাপিল ; আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ত্ম, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা, সেই অন্ধকারে ঢাকিল—কুঞ্জতীরভূমি, নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে আঁধার, আঁধার, আঁধার হইয়া লুকাইল।"

বাঙ্গালার এই বৈশিষ্ট্য কংগ্রেসে কিরূপ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল—কংগ্রেসের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহা কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সহিত দ্বিতীয় অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ মিলাইয়া পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে বাঙ্গালী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন—কিন্তু সে অধিবেশনে প্রতিষ্ঠানের রাজনীতিক রূপ প্রস্ফুট হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে কথার আলোচনা আমরা পরে যথাস্থানে করিব। তখন দেখা যাইবে, ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী মিষ্টার হিউম প্রথমে কংগ্রেসের যে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজনীতি বর্জ্জিত হইয়াছিল—কেবল সমাজ-নীতির স্থান প্রদত্ত হইয়াছিল। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ই লিখিয়াছেন, মিষ্টার হিউম তাঁহার কল্পনা তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডাফরিনের গোচর করিলে তিনিই সে কল্পনা পরিবর্ত্তন করিয়া রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কারণ, লর্ড ডাফরিন রাজনীতি-বিশারদ ছিলেন ; তিনি মনে করিয়াছিলেন, এ দেশের লোক যদি অভাব অভি-যোগ ব্যক্ত করিবার পথ পায়, তাহাতে ইংরাজ শাসনের আপদ-সম্ভাবনা হ্রাস পাইবে। বোধ হয়, সেই পরামর্শের আলোক এবং লর্ড রিপনের সময় সংঘটিত ও পূর্ব্বে আলোচিত ঘটনাবলী লক্ষ্য করিয়াই safety-valve রূপে হিউম কংগ্রেস কল্পিত করিয়াছিলেন। কংগ্রেসকে রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান-রূপে গঠন করিবার কার্য্যেও উমেশচন্দ্রের কত উদ্যোগ ও সাহায্য ছিল, তাহা তিনি তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়া যায়েন নাই বটে, কিন্তু

তাঁহার বন্ধু উমাকালী মুখোপাধ্যায়কে লিখিত তাঁহার পত্রে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, সে সকল পত্রের মাত্র কয়েকখানি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল—সেগুলিও সংগৃহীত হয় নাই।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল পূর্ব্বে যে বাঙ্গালায় রাজনীতি চর্চ্চা আরম্ভ হইয়া দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেখাইব। সে হিসাবে বলা যাইতে পারে, প্রকৃত কংগ্রেসের বীজ বাঙ্গালার কর্ষিত ভূমিতেই উপ্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালা তখন সেইরূপ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উপযোগী হইয়াছিল। বাঙ্গালীরা তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই ইংরাজের সম্ভুক্ত অধিকার প্রাপ্য হিসাবে চাহিয়া আসিয়াছেন—তাহাতে বঞ্চিত হইলে বিশেষ আপত্তি করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বেই বাঙ্গালীরা স্বদেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রাপ্তির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং স্বাব-লম্বন ব্যতীত যে স্বায়ত্ত-শাসন লাভ হয় না—হইলেও তাহা রক্ষা করা যায় না, তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। বাঙ্গালীরা তখন রাজনীতিক অধিকার আর কেবল বাঙ্গালাতেই নিবদ্ধ রাখিতে অসম্মত হইয়া সমগ্র ভারতের জন্য তাহা চাহিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা বাঙ্গালীর রাজনীতিচর্চ্চাকে সঙ্কুচিত করে নাই। সেই সঙ্কীর্ণতা অন্যান্য প্রদেশের বৈশিষ্ট্য—বাঙ্গালার নহে।

বাঙ্গালীই কংগ্রেসের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। আর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বিংশ বর্ষ পরে—বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালী দেশে নূতন ভাব প্রচারিত করিয়াছিল। বাঙ্গালী ভগীরথের মত সাধনা করিয়া সেই ভাবমন্দাকিনীধারা এ দেশে প্রবাহিত না করিলে এই জাতির জড়ত্ব-শাপ-মোচন হইত না। বাঙ্গালার গোমুখীমুখে সেই পাবনী ধারা প্রবাহিত হইয়া দেশকে যে ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, তাহার অনুপ্রেরণা ব্যতীত পরবর্ত্তী বিরাট আন্দোলন—অহিংস অসহযোগ যে কখন সম্ভব হইত

না, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। এই আন্দোলন বাঙ্গালার পূর্ব্ববর্ত্তী আন্দোলনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; ইহাতে যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহা বাঙ্গালার নিকট নূতন নহে, পরন্তু তাহার প্রবর্ত্তন বাঙ্গালায়। সে কথা এক দিন অন্যান্য প্রদেশের নেতারাও স্বীকার করিয়াছিলেন। বারাণসীতে (১৯০৫ খৃষ্টাব্দে) কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে সভাপতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিয়াছিলেন:—



"বঙ্গভঙ্গের ফলে বঙ্গদেশে যে বিরাট আন্দোলনের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা ভারতের জাতীয় উন্নতির ইতিহাসে স্মরণীয়। এ দেশে বৃটিশ শাসন প্রবর্ত্তনের পর এই প্রথম বর্ণ ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে জনগণ সকলে একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াছে এবং বাহিরের কোনরূপ উত্তেজনা ব্যতীত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সমগ্র প্রদেশের উপর প্রকৃত দেশাত্মবোধের তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং তাহার স্পর্শে এখন পুরাতন বিভেদ বিদূরিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত ঈর্ষ্যার

অবসান হইয়াছে, আর সব বিতর্কের বিলোপ ঘটিয়াছে। উগ্র ও অনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঙ্গালা যে ভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষ বিস্মিত ও প্রীত হইয়াছে এবং বাঙ্গালা যে লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছে, তাহাতে যখন সমগ্র দেশ সহানুভূতিতে ও উচ্চাকাঙ্ক্ষায় সম্মিলিত হইয়াছে, তখন বলিতেই হইবে বাঙ্গালার লাঞ্ছনাভোগ ব্যর্থ হয় নাই। বাঙ্গালায় যে আন্দোলন হইতেছে তাহা বন্যার জলোচ্ছ্বাস, তাহাতে সময় সময় কোথাও কোথাও তীরভূমি প্লাবিত হইয়া যায়—তাহা অবশ্যম্ভাবী। কারণ, যখন অন্ধকার হইতে আলোকের দিকে—পরবশ্যতা হইতে স্বাধীনতার দিকে জনগণ স্বতঃ অগ্রসর হয়, তখন এরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে ;—তাহাতে অধিক বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই। এই আন্দোলনে লক্ষ্য করিবার সর্ব্বপ্রধান বিষয় এই যে, ইহাতে জাতির বিশেষ শক্তি-বৃদ্ধি হইয়াছে এবং সে জন্য সমগ্র দেশ বাঙ্গালার নিকট কৃতজ্ঞতার ঋণে বদ্ধ। এ কথা বলা বাহুল্য যে, বাঙ্গালার জননায়কদিগকে যে সব বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে সে সব অসাধারণ—হয়ত বিপদ কেবল আরম্ভ হইয়াছে ; কিন্তু আমি জানি, কোনরূপ দায়িত্ববিমুখ হইবার কোন অভিপ্রায় তাঁহাদিগের নাই—যত ত্যাগ স্বীকারই কেন প্রয়োজন হউক না, তাঁহারা সানন্দে তাহাতে সম্মত হইবেন। সমগ্র দেশ আজ বাঙ্গালার নেতৃগণের পশ্চাতে দণ্ডায়মান এবং তাঁহারা তাঁহাদিগের কর্ম্মে সকল প্রদেশের সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করিবেন। তাঁহাদিগের পরিবাদ আমাদিগেরও পরিবাদ হইবে। বাঙ্গালার নেতারা যেন এ কথা বিস্মৃত না হয়েন যে, বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতের সম্মান তাঁহাদিগের উপর নির্ভর করিতেছে।”

সে দিন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রচারবেদী হইতে সভাপতি বলিয়াছিলেন, দেশাত্মবোধ বিস্তারের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষ বাঙ্গালার নিকট কৃতজ্ঞতার ঋণে বদ্ধ, আর ভারতবর্ষের সম্মান রক্ষার ভার বাঙ্গালাই গ্রহণ করিয়াছে।

কংগ্রেসের এই অধিবেশনেই লালা লজপত রায় বাঙ্গালায় চণ্ডনীতি সম্পর্কীয় প্রস্তাবের সমর্থন করিতে উঠিয়া বলিয়াছিলেন :— • • •

"আমরা বাঙ্গালার ভ্রাতৃবৃন্দের দুর্দ্দশার কথাই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান এ দেশে যে নূতন রাজনীতিক জীবনের উষালোক বিকাশের সৌভাগ্য বাঙ্গালাকে দিয়াছেন, সে জন্য বাঙ্গালাকে অভিনন্দিত করিতেই আমার ইচ্ছা হইতেছে। আমার মনে হয়, বাঙ্গালাই সর্ব্বাগ্রে ইংরাজী শিক্ষার স্বাদ পাইয়াছিল বলিয়া এই কায করিবার সম্মান বাঙ্গালার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। কোন কারণে বাঙ্গালা-সিংহ অবনত হইয়া শৃগালে পরিণত হইয়াছিল—এখন লর্ড কার্জ্জন তাহার বিবরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে উত্তেজিত করায় সে আপনার সিংহত্ব উপলব্ধি করিয়াছে। * * *

* * * * আপনাদিগের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ও স্বায়ত্ত-শাসন লাভের অধিকার সকলেরই আছে। এই উন্নতির পথে জয় যাত্রায় বাঙ্গালা যে অগ্রণী হইয়াছে, সে জন্য আমি বাঙ্গালাকে অভিনন্দিত করিতেছি—তাহাকে ঈর্ষ্যা করিতেছি। আমি যেমন বাঙ্গালার লোককে ঈর্ষ্যা করিতেছি, তেমনই তাঁহাদিগের জন্য গর্ব্বানুভবও করিতেছি। তাঁহারা বীরবিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা হইত, তাঁহারা সে ব্যঙ্গবিদ্রূপের কলঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়াছেন, যে মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা ভারত-বর্ষের অন্যান্য প্রদেশের অনুকরণীয়।"

তিনি বলেন, বাঙ্গালার লোকের পদাঙ্কানুসরণ করিলে ভারতবর্ষের লোক স্বাধীনতার মন্দিরে প্রবেশের অধিকার লাভ করিবে।

বাঙ্গালার এই আন্দোলন দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়াছিল এবং বাঙ্গালীরাই তাহাতে জয়যুক্ত হইয়াছিলেন।

এই আন্দোলন-কালেই বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় রাজদ্রোহাত্মক সভা সম্বন্ধীয় আইনের আলোচনা প্রসঙ্গে (১৯০৭ খৃষ্টাব্দে) গোখলে মহাশয় বলিয়াছিলেন, বাঙ্গলা অসন্তুষ্ট থাকিলে দেশে শান্তি থাকিবে না। তিনি বলেন, বাঙ্গালীরা ভাবপ্রবণ—তাহারা ক্ষতি ক্ষমা করিতে পারে, অপমান ক্ষমা করে না। তাহার পর সেই মহারাষ্ট্রীয় রাজনীতিক বলিয়াছিলেন ঃ—

"সংপ্রতি যে হাঙ্গামা হইয়াছে, তাহাতে যে সব বাঙ্গালী লাঞ্ছনাভোগ করিয়াছে, তাহারা যে তদন্তের সময় সাক্ষ্য দিতেও অস্বীকার করিয়াছে, তাহাতেই বাঙ্গালায় পরিবর্ত্তন প্রতিভাত হয়। সরকার দমননীতির দ্বারা এই পরিবর্ত্তন প্রহত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালার লোককে জানি বলিয়াই আমি বলিতেছি—আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি, বাঙ্গালীরা বলে দলিত হইবে না। বহু বিষয়ে ভারতবর্ষে বাঙ্গালীরা অসাধারণ জাতি। তাহাদিগের ত্রুটির কথা বলা সহজ। ত্রুটি সর্ব্বাগ্রে লক্ষিত হয়। কিন্তু তাহাদিগের নানা গুণ সময় সময় উপেক্ষিত হইয়া থাকে। ভারতবাসীর পক্ষে যে সব পথ মুক্ত সে সকলের প্রায় সকল পথেই বাঙ্গালীরা খ্যাতি লাভ করিয়াছে। অল্পকালমধ্যে এ দেশে যে সব সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কারকের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে বাঙ্গালীর অভাব নাই। এ দেশে বক্তা, সাংবাদিক ও রাজনীতিকদিগের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বপ্রধান তাঁহাদিগের মধ্যেও বাঙ্গালীর অভাব নাই। কিন্তু এই সভায় এই সব লোকের অনাদর বিবেচনা করিয়া আমি তাঁহাদিগের কথা বলিতে বিরত হইতেছি। তবে বিজ্ঞান, আইন ও সাহিত্য ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? সমগ্র ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু ও ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পার্শ্বে আর কাহার স্থান হইতে পারে? কোথায় ডাক্তার (রাসবিহারী) ঘোষের মত ব্যবস্থাবিশারদ বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত সাহিত্যিক পাওয়া যাইবে? এই সকল লোক

সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নহেন, পরন্তু বাঙ্গালী জাতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এ জাতি কখন বলে দলিত হইবার নহে। পূর্ব্বে তাহাদিগের জাতীয় চরিত্রে একটি বিশেষ ত্রুটির কথা বলা হইত—তাহাদিগের দৈহিক সাহসের অভাব আছে, ইহাই শুনা যাইত। কিন্তু সেই বিষয়ে তাহাদিগকে যে উপহাস করা হইত, তাহাতেই তাহারা সে ত্রুটি বর্জ্জন করিয়াছে এবং অ্যাংলোইণ্ডিয়ান পত্রের কথা যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে এখন তাহারা শারীরিক সঙ্ঘর্ষে শক্তিপরীক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।”

এই গোখলে মহাশয়ই এক দিন বলিয়াছিলেন—

“চিন্তারাজ্যে ভারতে বাঙ্গালাই অগ্রণী; আজ বাঙ্গালা যাহা চিন্তা করে, ভারতের অবশিষ্টাংশ পরে সেই চিন্তায় অবহিত হয়।”

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের যে অধিবেশন হয় বিহারের দীপনারায়ণ সিংহ তাহার সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন:—

“আমি আপনাদিগকে দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি, বাঙ্গালা মাতৃভূমির জন্য যে কার্য্য করিয়াছে ও করিতেছে, আমরা সে জন্য বাঙ্গালার নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসাই করি। বিহারের সকল অধিবাসীই আমার এই মতের সমর্থন করিবেন। গত দুই বৎসরে আপনাদিগের কৃত কর্ম্ম সম্বন্ধে আপনারা গর্ব্বানুভব করিতে পারেন। আপনাদিগের প্রদেশই ভারতীয় জাতীয়তার সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং যে নবভাব সমগ্র দেশকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে প্রধানতঃ বাঙ্গালীর চেষ্টাতেই তাহার ব্যাপ্তিলাভ ঘটিয়াছে। * * এই জাতীয় ভাবই বাঙ্গালীকে ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ও আত্মশক্তিতে প্রত্যয়-সম্পন্ন করিয়াছে।”

বারাণসীতে গোখলে মহাশয় প্লাবনোচ্ছ্বাসজনিত যে আতিশয্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন, সে বিষয়েও বাঙ্গালা তাহার বৈশিষ্ট্য—সংযম ও

রাজনীতিকোচিত দূরদর্শন দেখাইয়াছিল। ভগীরথের স্তবতুষ্টা গঙ্গা যখন সগরসন্তানদিগের উদ্ধার সাধন জন্য এই পূণ্য ভূমিতে অবতীর্ণ হইতে সম্মতা হইয়াছিলেন, তখন এক সমস্যার সমুদ্ভব হয়—কে তাঁহার অবতরণবেগ ধারণ করিবেন? কেহ সে বেগ ধারণ না করিলে তাহাতে সৃষ্টি ধ্বংস হইয়া যাইবে। তখন মহাদেব সে বেগ ধারণ করিতে স্বীকৃত হয়েন এবং গঙ্গা তাঁহার মস্তকে পতিত হইয়া জটাজালমধ্যে পথ সন্ধান করিয়া আপনার বেগ সংযমান্তে ধরণীতে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে বাঙ্গালাই দেশাত্মবোধবিকাশের বেগ ধারণ করিয়াছিল—বাঙ্গালার ত্যাগে তাহার নিদর্শন সপ্রকাশ। তাহার পর সেই সংযত ভাব বাঙ্গালা হইতে সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হয় এবং তাহার স্পর্শে জাতির উদ্ধার সাধন সুগম হয়।

সেই ভাবের প্রভাব যে কংগ্রেসকে নূতন করিয়া গঠন করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে? সেই ভাববিকাশের সঙ্গে কংগ্রেসের পুরাতন পদ্ধতির দৈন্য সপ্রকাশ হইল। বাঙ্গালায় বাঙ্গালী কবি রবীন্দ্রনাথের উক্তির যাথার্থ্য, কেবল বাঙ্গালী নহে, সকল ভারতবাসীই উপলব্ধি করিল।

"(মিছে) কথার বাঁধুনী কাঁদুনীর পালা
চোখে নাই কারো নীর
আবেদন আর নিবেদনের থালা
ব'হে ব'হে নত শির।
কাঁদিয়ে সোহাগ—ছি ছি এ কি লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,
আপনি করি নে আপনার কাজ,
(করি) পরের পরে অভিমান!

(ছি ছি) পরের কাছে অভিমান !
"(ওগো) আপনি নামাও কলঙ্ক-পশরা
যেও না পরের দ্বার ;
পরের পায়ে ধ'রে মান ভিক্ষা করা
সকল ভিক্ষার ছার ।
'দাও ! দাও !' ব'লে পরের পিছু পিছু,
কাঁদিয়ে বেড়ালে মেলে না ত কিছু,
(যদি) মান পেতে চাও প্রাণ পেতে দাও
প্রাণ আগে কর দান" ।

এই যে স্বাবলম্বনের আদর ও ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ—এ আদর্শও কংগ্রেসে বাঙ্গালার দান—ইহা অমূল্য ।

এই নূতন মতের সহিত পুরাতন মতের সঙ্ঘর্ষ ঘটিয়াছিল এবং সেই সঙ্ঘর্ষে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু সেই যে বিনাশ তাহা নূতন স্থষ্টির জন্য। তাহার প্রমাণ পরবর্ত্তী কংগ্রেসে প্রত্যক্ষ করা যায়। অসহ-যোগ এই স্বাবলম্বনের উপর প্রতিষ্ঠিত ।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতেই মতসংঘর্ষের আরম্ভ। আর লক্ষ্ণৌ সহরে যুক্ত অধিবেশনের সর্ব্বত্র নূত মতের জয় প্রতিভাত হইয়াছিল ।

ত্যাগের রত্নবেদী লাঞ্ছনার গঙ্গোদকে ধৌত করিয়া বাঙ্গালী তাহার উপর দেশমাতৃকার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবার পুষ্পে ও ভক্তির চন্দনে সেই মূর্ত্তির পূজা করিয়াছে—আগ্রহের পঞ্চ-প্রদীপ-শিখা মনীষার গব্যঘৃতে পুষ্ট করিয়া আরতি করিয়াছে। সে "প্রাণ আগে কর দান"—উক্তি সার্থক করিয়াছে ।

কংগ্রেস জাতির যে রাজনীতিক উন্নতির ইতিহাস সেই উন্নতির পথে জয়যাত্রায় বাঙ্গালীর তূর্য্যনিনাদই সুপ্ত দেশবাসীকে জাগ্রত ও আকৃষ্ট করিয়া শুনাইয়াছিল— "বন্দে মাতরং ।"

প্রথম অধ্যায়

বাঙ্গালায় রাজনীতিচর্চ্চা

এ দেশে জন্মভূমিকে জননী মনে করিয়া ভক্তি ও সেবা করিবার আদর্শ যে অতি পূর্ব্বকালের তাহাতে সন্দেহ নাই। য়ুরোপের লোক স্বদেশকে "পিতৃভূমি" (Father land) বলে; আমরা মাতৃভূমি বলি। পিতার সহিত সন্তানের সম্বন্ধ অবশ্যই ঘনিষ্ঠ কিন্তু মাতার সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর। এ ক্ষেত্রেও য়ুরোপের আদর্শ আর আমাদিগের আদর্শ বিভিন্ন। মেকলে রোমের প্রাচীন কাহিনী লইয়া যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখিতে পাই, রোমের বীর সন্তান রোমের টাইবার নদীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

"Oh Tiber; Father Tiber!
To whom the Romans pray!
A Roman's life, a Roman's arms
Take thou in charge this day!"

কিন্তু এ দেশে গঙ্গাকে আমরা মাতা বলিয়া আসিতেছি। সে কালের "গঙ্গার বন্দনায়" সেই—

"বন্দ মাতা সুরধুনী পুরাণে মহিমা শুনি
পতিতপাবনী পুরাতনী।"

হইতে আরম্ভ করিয়া হেমচন্দ্রের "বন্দে মাতর্গঙ্গে"—

"তুই মা জাহ্নবি অর্ঘ্যমহিমাছবি উজ্জ্বল উন্নত যত ইহ ভুবনে
তোমারি নীরধারে যুগযুগান্তরে হৈল প্রকাশিত ভারত-জীবনে,

রাজ্য বাণিজ্য দেশ দুর্গপুরি অশেষ অস্ত উদয় কত হেরিলে অপাঙ্গে
বন্দে মাতর্গঙ্গে।"

পর্য্যন্ত সবই জননীর বন্দনা। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতাতেও সে



দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি "পতিতোদ্ধারিনী গঙ্গে" গানে গাহিয়াছিলেন—

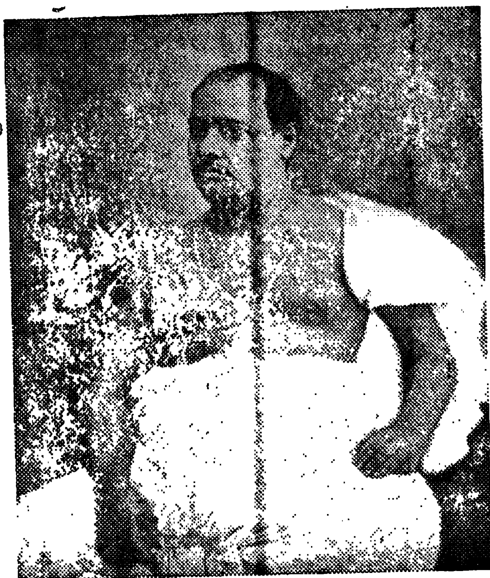
পরিহরি ভবসুখদুঃখ যখন মা, শায়িত অন্তিম শয়নে
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে,
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে
মা ভাগীরথি! জাহ্নবি! সুরধুনি! কলকল্লোলিনি গঙ্গে!"

দেশকেও আমরা মা বলিয়া মনে করি।

নীলাম্বুবেলা হইতে স্বর্ণলঙ্কার সৌন্দর্য্য দেখিয়া লক্ষণ যখন বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তখন রামচন্দ্র তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—স্বর্ণলঙ্কা যত সৌন্দর্য্যময়ীই কেন হউক না, আমার নয়নের পক্ষে রুচিকর, নহে; কারণ—লঙ্কা আমার নহে; পরন্তু—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

কিন্তু তখন জন্মভূমি বলিতে সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝাইত কি না সে



কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদে কথায় আমরা

"যে মা'র কোলে নাচি, শস্যে বাঁচি
তৃষ্ণা জুড়াই যাঁর জলে"

সে মা তখন ভারতমাতা কি না বলা যায় না। পরবর্ত্তী কালে যে সে ভাব ছিল না, তাহা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ইতিহাস পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। সমগ্র ভারতবর্ষকে জন্মভূমি—জননী জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিবার আদর্শ এ দেশে নূতন। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে এ দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, সমগ্র ভারতবর্ষকে জন্মভূমি—জননী—জ্ঞান করা বাঙ্গালার নব যুগের দান। কংগ্রেস উপলক্ষে রচিত রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে,—

"অয়ি ভুবনমনোমোহিনি !
অয়ি নির্ম্মলসূর্য্যকরোজ্জ্বলধরণি !
জনক-জননী-জননি !
নীলসিন্ধুজলধৌতচরণতল,
অনিলবিকম্পিতশ্যামল-অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিতভাল হিমাচল,
শুভ্রতুষারকিরীটিনি !
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে,
জ্ঞান ধর্ম্ম কত কাব্যকাহিনী !
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা বিগলিত করুণা,
পুণ্যপীয়ূষস্তন্যবাহিনি !"

এই যে নূতন ভাব ইহা বাঙ্গালার পুণ্য ভূমিতেই প্রসূত ও বাঙ্গালীর মনীষার স্তন্যে পুষ্ট। সে কথা দীপনারায়ণ সিংহের বক্তৃতায় ব্যক্ত হইয়াছে।

লালা লাজপত রায়ের মত এই যে, বাঙ্গালাই ভারতবর্ষের প্রদেশসমূহের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াছিল বলিয়াই এই ভাব প্রথম বাঙ্গালায় প্রস্ফুরিত হইয়াছিল।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ভারতের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন হয়। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস বাঙ্গালার গভর্ণর হয়েন। ক্লাইব এ দেশে ইংরাজের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, হেষ্টিংস ইংরাজের শাসন প্রবর্ত্তিত করেন। এই শাসনকার্য্য পরিচালনের জন্য ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতবাসীর প্রয়োজন হয় এবং ইংরাজ বাঙ্গালায় ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের দিকে মন দেন। যে বৎসর ওয়ারেন হেষ্টিংস বাঙ্গালার গভর্ণর হইয়া আইসেন, সেই বৎসরেই রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা হয় এবং তাহাতেও ইংরাজী শিক্ষায় লোকের আগ্রহবৃদ্ধি ঘটে—কারণ, তখন এটর্ণীর কেরাণী হওয়া অনেকের কাম্য হয়। বাঙ্গালায় প্রথম ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির নাম—রামমোহন মিস্ত্রী। রামমোহন শিক্ষকের কায করিতে থাকেন। তাহার পর রামমোহন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু, ভুবন দত্ত, শিবু দত্ত, এরাটুন পিটার্স, সেরবোর্ণ প্রভৃতি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু তখন উপযুক্ত পুস্তকের অভাব অনুভূত হয়। ডেভিড হেয়ার ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বটে, কিন্তু শিক্ষা সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন ছিল না এবং বহু বাঙ্গালী যুবক ইংরাজী শিক্ষায় আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের মধ্যে রাজনীতিক অধিকারবোধ হয় এবং তাহা দিন দিন পুষ্টি লাভ করিতে থাকে।

রামমোহন রায়ের জীবনের ঘটনাবলীর আলোচনা করিলে দেখা যায় তাঁহার স্বাধীনতাপ্রীতি কেবল ধর্ম্মমতেই নিবদ্ধ ছিল না, পরন্তু রাজনীতি-ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইয়াছিল। অন্যান্য কথা ত্যাগ করিলে আমরা তাহার

প্রবল অভিব্যক্তি দেখিতে পাই—১৮২৩ খৃষ্টাব্দে সরকার কর্ত্তৃক সংবাদপত্রের অধিকার-সঙ্কোচক ব্যবস্থার প্রতিবাদে। এ দেশে সংবাদপত্র প্রথম য়ুরোপীয়-



ঃ রাজা রামমোহন রায় ঃ

দিগের দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হয় এবং প্রথম যুগের পত্রগুলিতে রাজপুরুষদিগের সম্বন্ধে এত তীব্র আক্রমণ বা এমন স্তুতি থাকিত যে, সার উইলিয়ম উইলশন হাণ্টার লিখিয়াছেন, "Scurrility and servility, indeed, long seemed the only two notes known to Calcutta journalism" সমালোচনায় অসহিষ্ণু রাজপুরুষরাও সংবাদপত্র দলনের চেষ্টার ক্রটি করেন

নাই। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম বোল্টস কলিকাতায় একটি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন। কিন্তু সে আয়োজন সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে বাঙ্গলা ত্যাগ করিয়া মাদ্রাজের পথে যুরোপে যাইতে আদেশ করা হয়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে জেমস অগষ্টাস্ হিকী প্রথম কলিকাতায় ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। নানারূপ চেষ্টা ও মামলার পর ওয়ারেন হেষ্টিংস সংবাদপত্রখানি বন্ধ করিতে পারেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গল জার্ণালে' প্রকাশিত রচনার জন্য উইলিয়ম ডুয়েনকে গ্রেপ্তার করিয়া যুরোপে যাইবার আদেশ করা হয়। ইহার পর সংবাদপত্রের অধিকার-সঙ্কোচক নানা বিধি বিধিবদ্ধ করা হয় এবং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ক্যালকাটা জার্ণালের' সম্পাদক সিল্ক বাকিংহামকে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে অবিলম্বে বিলাতে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করা হয়। বাকিংহামের এ দেশ ত্যাগের পরই সরকার সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কঠোর আইন করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন এবং সে সময়ের নিয়মানুসারে ১৫ই মার্চ্চ তারিখে এক বিধির খসড়া সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা হয়।

১৫ই তারিখে সরকারের বিধির খসড়া পেশ হইলে ১৭ই তারিখে তাহাতে আপত্তি করিয়া আদালতে দরখাস্ত পেশ করা হয়। দরখাস্তকারী—

চন্দ্রকুমার ঠাকুর
দ্বারকানাথ ঠাকুর
রামমোহন রায়
হরচন্দ্র ঘোষ
গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রসন্নকুমার ঠাকুর

হরচন্দ্রের বয়স তখন ১৫ বৎসর, দ্বারকানাথের ৩০ বৎসর ও প্রসন্নকুমারের ২২ বৎসর। প্রসন্নকুমার দ্বারকানাথেরই মত প্রথমে সেরবোর্ণের স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং হরচন্দ্র

হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। দেখা যাইতেছে, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসঙ্কোচচেষ্টার প্রতিবাদে রামমোহন একক ছিলেন না; পরন্তু আরও



প্রসন্নকুমার ঠাকুর

৫ জন বাঙ্গালী তাঁহার সহকর্ম্মী হইয়াছিলেন। ইঁহারা যে দরখাস্ত পেশ করেন তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, তাঁহারা স্বাধীনতার কিরূপ অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন।

যখন সংবাদপত্রের-অধিকার সঙ্কোচের এই নূতন চেষ্টা হয়, তাহারও পূর্ব্বে সভা সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই

যে সেই ব্যবস্থার প্রতিবাদে কলিকাতা টাউন হলে যে সভা হয়, তাহাতে দ্বারকানাথ ঠাকুর বলিয়াছিলেন, ১০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার ২জন আত্মীয় ও তাঁহার বন্ধু রামমোহন রায়ের সহিত একযোগে এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, তিনি সেই দরখাস্তে স্বাক্ষর দানের জন্য কোন য়ুরোপীয়কে অনুরোধ করেন নাই ; কারণ, তাহা করিলে হয়ত য়ুরোপীয় স্বাক্ষরকারীদিগকে এ দেশ হইতে বিতাড়িত করা হইত। অনেক ভারতীয়ও তাঁহার সহকর্ম্মী হইতে ভয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি যে কয় জন বাঙ্গালী এ কার্য্যে তাঁহার সহিত একযোগে কায করিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গেই আমরা একটি পরবর্ত্তী ঘটনার উল্লেখ করিব। সুপ্রিম কোর্টে সংবাদপত্রের ক্ষমতাসঙ্কোচক ব্যবস্থা বাতিল করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সার চার্লস মেট্‌কাফ বড় লাট হইয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দেন। সেই ন্যায়সঙ্গত কার্য্যের জন্য বিলাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টাররা তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইলে তিনি পদত্যাগসঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন। কিন্তু এ দেশের লোক এই কার্য্যের জন্য তাঁহাকে কেবল অভিনন্দিত করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই ; পরন্তু অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটি বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করান এবং তাহাতে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাও করেন। লর্ড কার্জ্জন যখন কলিকাতায় এই গ্রন্থাগারটি সরকারের গ্রন্থাগারের সহিত সম্মিলিত করেন, তখন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী সেই মেট্‌কাফ্ হলেই স্থান পাইয়াছিল। তাহার পর সরকার জনসাধারণের সম্পত্তি পুস্তকগুলি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী-ভুক্ত করিয়া আপনাদিগের গৃহে স্থানান্তরিত করিয়াছেন এবং সময় সময় সমগ্র লাইব্রেরীটি দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাবও যে শুনা যায় না, এমন নহে। কেবল তাহাই নহে, কোন অনির্দ্দেশ্য কারণে বাঙ্গালার জনসাধারণের অর্থে নির্ম্মিত মেটকাফ হল নামক সুরম্য গৃহটিও সরকার অধিকার করিয়া

তাহা আপনাদিগের প্রয়োজনে ব্যবহার করিতেছেন। ইহাতে কি জনসাধারণের সম্পত্তিতে জনসাধারণের অধিকার আইনতঃ লুপ্ত হইতে পারে ?

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রকুমার ঠাকুর প্রমুখ বাঙ্গালীদিগের কার্য্যে বাঙ্গালায় প্রতীচ্য দেশে সমাদৃত রাজনীতিক অধিকার লাভের ও রক্ষার চেষ্টার আরম্ভ বিশেষরূপ প্রতিপন্ন হয়।

বাঙ্গালায় ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ হইতে লাগিল। প্রথমে তাহা অধিকার লাভের ও প্রাপ্ত অধিকার রক্ষার চেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করিল। আর ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকগণ স্থির বুঝিলেন, আন্দোলন ব্যতীত অধিকার লাভ বা রক্ষা করা সম্ভব নহে। হিন্দু কলেজ



তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী

প্রতিষ্ঠার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই হিন্দু কলেজের ছাত্ররা আন্দোলনের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া তাহার প্রবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন।

দেশের জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকল্পে তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় সংবাদ-পত্র প্রচারও করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যে সব সভাসমিতি সংস্থাপিত করিতে লাগিলেন, সে সকলে রাজনীতিক বিষয়ও আলোচিত হইতে লাগিল। ক্রমে ইঁহারা জ্ঞানানুশীলন জন্য একটি সভা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভব করিয়া এক সভার অনুষ্ঠানপত্র প্রচার করিলেন। সে



প্যারীচাঁদ মিত্র

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের কথা। ঐ বৎসর ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও রাজকৃষ্ণ দে—এই কয় জনের স্বাক্ষরে যে অনুষ্ঠানপত্র প্রচারিত হয়,

তাহাতে বলা হয়, সর্ব্ববিধ জ্ঞান অর্জ্জনে পরস্পরের সহায়তা ও পরস্পরের মধ্যে প্রীতিবর্দ্ধন জন্য এক সভা প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। যাহাতে সভার সদস্যদিগের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ক্ষুন্ন না হয়, সেই জন্য নিয়ম করা হয়—কেহ বক্তৃতা করিবেন বলিয়া উপযুক্ত কারণ ব্যতীত বক্তৃতা না করিলে তাঁহাকে জরিমানা দিতে হইবে। সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন সম্পাদক রামকমল সেনের নিকট হইতে কলেজের বৃহৎ কক্ষ ব্যবহারের অনুমতি লইয়া তথায় সভাধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয় এবং সেই সভায় তারাচাঁদকে সভাপতি করিয়া জ্ঞানার্জ্জন সভা (Society for the Acquisition of General Knowledge) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সভায় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। এই সভায় রাজনীতিক বিষয়ের আলোচনাও হইত। এক দিন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলে রামগোপাল ঘোষ তাহার আলোচনাপ্রসঙ্গে রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিলে সেই সভায় উপস্থিত ক্যাপ্টেন ডি, এল, রিচার্ডশন ইংরাজীভাষী বাঙ্গালী যুবকদিগের এইরূপ মতপ্রকাশে এমনই বিচলিত হয়েন যে, ঐ গৃহে সভার অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিতে চাহেন। তিনি বলেন, তিনি বিদ্যামন্দিরকে কিছুতেই রাজদ্রোহের আড্ডা হইতে দিবেন না। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় রিচার্ডশনের কথার উত্তর দেন। তদবধি এই রাজনীতিপ্রিয় যুবকদলকে "তারাচাঁদের দল" (Chakrabarty Faction) বলা হইত।

যখন এইরূপে বাঙ্গলার ইংরাজী শিক্ষিত যুবকরা রাজনীতিচর্চ্চা করিতেছিলেন, সেই সময় একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন বিলাতে উপস্থিত হয়েন, তখন জর্জ্জ টমশন নামক এক জন ইংরাজ তথায় ভারতবর্ষের বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ম্যাঞ্চেষ্টারে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে ৬টি বক্তৃতা দেন, সেগুলি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সংগৃহীতভাবে প্রকাশিত হয়। সেগুলি পাঠ করিলে বুঝা

যায়, তিনি ভারতবাসীর দারিদ্র্যদুঃখ দূর করিতে অভিলাষী ও ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে শিল্পের উপকরণ সংগ্রহে আগ্রহশীল ছিলেন। দ্বিতীয়



দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বক্তৃতায় তিনি ভারতবাসীর মনে অসন্তোষ সঞ্চয়ের কথায় কয় জন লোকের মত উদ্ধৃত করেন :—

(১) কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের রেজিষ্ট্রার ডিকেন্স বলেন, ভারতবর্ষের লোকের মধ্যে শঙ্কা ও বিরক্তিভাব প্রবল—যদি ইহার প্রতীকার সম্বন্ধে নিরাশায় এই ভাবের পরিণতি হয়, তবে অন্যায়ের উপলব্ধিতে মনে যে ভাবের উদ্ভব হয়, তাহারই উদ্ভব হইবে।

(২) দ্বারকানাথ ঠাকুর বলেন, আমরা মুসলমান শাসনের অত্যাচারের কথা বলিয়া থাকি, কিন্তু ইংরাজরা কি করিতেছেন? মুসলমানদিগের বদান্যে আমরা যাহা পাইয়াছিলাম, ইঁহারা তাহাতেও আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছেন। অত্যাচারপরায়ণ, ধর্ম্মান্ধ ও অর্দ্ধবর্ব্বর সরকার যাহা দিয়াছিলেন, ন্যায়পরায়ণ, উদার ও সুসভ্য ইংরাজ তাহাও লইয়া যাইতেছেন। ইহাই কি আমাদিগের শাসকদিগের গর্ব্ব করিবার বিষয়—ন্যায় ও উদারতা?

(৩) মিষ্টার সোর বলেন, লোক আমাদিগকে ঘৃণা করে--ইত্যাদি।

এই সকল উক্তির দ্বারা তিনি ইংরাজ জনসাধারণকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহাদিগের দায়িত্ব বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করেন।

এ দেশে বিলাতের শিল্পের উপকরণ সংগ্রহে তাঁহার আগ্রহের বিষয় আমরা বর্ত্তমানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব না---তাহা আমাদিগের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত। কেবল বলা যাইতে পারে, যাহাতে অন্যান্য দেশ হইতে তূলা না লইয়া বিলাত ভারতবর্ষ হইতে তূলা লইতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে বিলাতে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে আমদানী তূলার পরিমাণ এইরূপ ছিল :—

দেশ	(পাউণ্ড অর্থাৎ অর্দ্ধসের)
বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ...	১০,১২৮,০০০
ফরাসী, স্পেনিস ও পর্টুগিজ উপনিবেশ	১৪,৩০০,০০০
স্মীর্ণা ও তুর্কী	৪,৭০০,০০০

ব্যুরবন দ্বীপ	১৪৮,০০০
স্থরাট (ফ্লাণ্ডার্স ও ডেনমার্কের পথে)	২,০০০,০০০

বিলাতেই ৩২,৫৭৬,০০০ পাউণ্ড তূলা পণ্য প্রস্তুত করিবার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ঐ বৎসর ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে আমদানী তূলার পরিমাণ মাত্র ২,০০০,০০০ পাউণ্ড এবং ঐ বৎসরই প্রথম ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে তূলা আমদানী হয়। কিন্তু তখনও ভারতীয় তূলা বিদেশের পথে বিলাতে যায়। সেই জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষ হইতে ৫,০০,০০ পাউণ্ড তূলা পাঠাইবার জন্য গভর্ণর-জেনারলকে আদেশ করেন। কিন্তু সে আদেশ পালন করা সম্ভব হয় নাই। সেই সময় এ দেশে তূলা সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান হয়, তাহাতে দেখা যায়, তখনও বাঙ্গালার নানা জিলায় তূলা উৎপন্ন হইত। তৎকালীন রিপোর্ট হইতে আমরা তাহার বিবরণ প্রদান করিলাম ঃ—

স্থান	পাউণ্ড
বীরভূম	৭৪০,০০০
বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া)	৭৪০,০০০
বর্দ্ধমান	৩,৭০৮,০০০
যশোহর	৪৬৪,০০০
ময়মনসিংহ	(অজ্ঞাত)
মুর্শিদাবাদ	৬,৬০০
নদীয়া	২২০,০০০
পূর্ণিয়া	(অজ্ঞাত)
রাজসাহী	(অতি সামান্য)
রংপুর	২৬,৭৫০
ত্রিপুরা	৮০০,০০০

মেদিনীপুর	৩২,৪৮৬
রাঙ্গামাটী	৬৪০,০০০
মেদিনীপুর (?)	৬৮,৯৬০
শান্তিপুর (নদীয়া)	১০৩,০০০
চট্টগ্রাম	৪৯,০০০
মালদহ	১৩২,০০০
ঢাকা	৩৮৪.০০০

বাঙ্গালায় যে তূলা উৎপন্ন হইত, তাহা ব্যতীত অন্যান্য স্থান হইতে বাঙ্গালায় তূলা আমদানী করিতে হইত। মনোযোগের অভাবে এখন ঐ সব স্থানে তূলার চাষ বন্ধ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন ও তাহাদিগের মন হইতে বৃটিশ-বিদ্বেষ দূর না করিলে যে তাহারা সন্তুষ্ট থাকিয়া বিলাতের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক শক্তি বৃদ্ধি করিবে না, তাহা বুঝিয়া টমশন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে মার্কিণে নিগ্রোদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্তিদানের আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। সে কার্য্যে সাফল্য লাভের পর তিনি ভারতবর্ষের লোকের দিকে বিলাতের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে দুর্ভিক্ষহেতু লোকক্ষয়ের যে বিবরণ বিলাতে পৌছিয়াছিল, তাহা যে টমশনের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

টমশনের চেষ্টায় বিলাতে British India Society প্রতিষ্ঠার আয়োজন ও ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ঐ সমিতি প্রতিষ্ঠা হয়। লর্ড ব্রুহামের সভাপতিত্বে এক সভায় এই সমিতির উদ্বোধন হয় এবং ইহার দৃষ্টান্তে বিলাতের নানা স্থানে এই উদ্দেশ্যে আরও কয়টি সমিতির উদ্ভব হয়। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত শাসন-পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিলে

যখন বিলাতের কোন কোন পত্র তাঁহার কথার প্রতিবাদ করেন, তখন তিনি, প্রয়োজন অনুভব করিয়া, 'British Indian Advocate' নাম দিয়া একখানি মাসিক পত্র প্রচার করিতে থাকেন।

যখন টমশন এইরূপে বিলাতের লোককে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহাদিগের দায়িত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে



দ্বারকানাথ ঠাকুর

গমন করেন। তিনি টমশনকে ভারতে যাইয়া স্বয়ং প্রকৃত অবস্থা দেখিতে আহ্বান করেন; এবং সেই আহ্বানে টমশন ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে দ্বারকানাথের সহিত ভারতে আগমন করেন।

দ্বারকানাথের চরিতকার কিশোরী চাঁদ মিত্র বলিয়াছেন, টমশনের বক্তৃতা কলিকাতায় বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রবাহিত করিতে থাকে। আমরা পূর্ব্বেই রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকদিগের রাজনীতি-চর্চ্চার কথা বলিয়াছি। টমশন এ দেশে আসিলে তাঁহারা টমশনের সহিত মিলিত হয়েন। যাঁহারা সে সময় টমশনের নিকট শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—



কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, চন্দ্রশেখর দেব।

তখন কলিকাতায় বাঙ্গালীর সভাসমিতির অধিবেশন-স্থানের বিশেষ অভাব ছিল। তাহা অনুভব করিয়াই পরে কেশবচন্দ্র সেন এলবার্ট হল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যে সব বাঙ্গালী যুবক রাজনীতিচর্চ্চা করিতেন, তাঁহাদিগকে হিন্দু কলেজের "হল" ব্যবহারে বঞ্চিত করিবার জন্য ক্যাপ্টেন রিচার্ডশন যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করাও হইয়াছে।

এই অবস্থায় মাণিকতলায় বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগান বাড়ীতে সভাধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়। তখন মাণিকতলায় যে বহু লোকের বাস ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে সে অঞ্চলে পথও ভাল ছিল না। তখন কলিকাতায় যানেরও বাহুল্য ছিল না। বোধ হয়, সেই সকল কারণেই অল্প দিন পরে সভাধিবেশনের স্থানপরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয়। তখন ৩১ নং ফৌজদারী বালাখানায় ডাক্তার দ্বারকানাথ গুপ্তের ও ডাক্তার গৌরীশঙ্কর মিত্রের—গুপ্ত মিত্র কোম্পানী নামে পরিচিত—এক ডাক্তারখানা ছিল। ডাক্তারখানা নিম্নতলে ছিল এবং তাহার অধিকারীরা ঐ গৃহের দ্বিতলস্থ কক্ষ সভাধিবেশনের জন্য প্রদান করেন। এই স্থানে যখন টমশন বক্তৃতা করিতেন, তখন ইংরাজী পত্রে তাহা লইয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হইত। এই স্থানে যে Bengal British India Society প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহই৷ পরে Landholders' Society র সহিত সম্মিলিত হইয়া British Indian Association এ পরিণত হয়।

আজ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন জমীদার সভায় পরিণত হইয়া যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া তাহার অতীত অবস্থা অনুমান করাই হয়ত দুষ্কর হইবে। তখন ইহাই দেশের প্রথম ও প্রধান প্রতিষ্ঠান এবং তৎকালপ্রচলিত রাজনীতিক মত ইহার দ্বারা ধ্বনিত হইত।

ক্যাপ্টেন রিচার্ডশন যে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষা প্রকাশে বিশেষ বিচলিত হইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। ভারতবাসীর বিস্তৃত রাজনীতিক অধিকার লাভের বাসনা ইংরাজদিগের পক্ষে বিরক্তিকর ছিল। তাঁহারা কি মনে করিতেন, তাহা, পরে, হেমচন্দ্র তাঁহার ব্যঙ্গ কবিতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন:—

"পরের অধীন দাসের জাতি—নেশান আবার তারা?
তাদের আবার এজিটেশন?—নক্কণ উঁচু করা।"

কাযেই প্রবাসী ইংরাজদিগের সহিত রাজনীতিক আন্দোলনকারী বাঙ্গালীদিগের সঙ্ঘর্ষ হইতে লাগিল। লর্ড হার্ডিং শিক্ষিত ভারতবাসীদিগকে উচ্চ রাজপদ প্রদান সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, তজ্জন্য ফ্রি চার্চ্চ ইনষ্টিটিউসনে (এই বিদ্যালয় নীমতলা ঘাট ষ্ট্রীটে অবস্থিত ও "ডাফ সাহেবের কলেজ" নামে পরিচিত ছিল। কলিকাতায় স্কচ ধর্ম্মযাজকদিগের দুইটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্মিলিত হইবার পর উহার গৃহ বাঙ্গালা সরকার ক্রয় করিয়া জোড়াবাগান পুলিস থানা করিয়াছেন) তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার জন্য যে সভা হয়, রামগোপাল তাহাতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা করেন। সে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের কথা। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার স্মৃতিরক্ষা কল্পে টাউন হলে সভা হয়, তখন ইংরাজরা লর্ড হার্ডিং এর চিত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিলে রামগোপাল তাহাতে আপত্তি করিয়া, মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন এবং সভায় তাঁহার প্রস্তাবই গৃহীত হয়। এই পরাজয়ে ইংরাজরা অসন্তুষ্ট হয়েন।



রামগোপাল ঘোষ

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সরকার কয়খানি নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েন—

(১) An Act for Abolishing Exemption from the Jurisdiction of the East India Company's Criminal Courts.

(২) An Act Declaring the Law as to the Privelege of Her Majesty's European Subjects.

(৩) An Act for Trial by Jury.

(৪) An Act for the Protection of Judicial Officers.

এই আইন চারিখানিই বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—এক শ্রেণীর প্রজাকে সাধারণ ব্যবস্থার বাহিরে রক্ষা করিবার জন্য কল্পিত। এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই আইন কয়খানিকে Black Acts বলিয়া অভিহিত করেন ও এইগুলির প্রতিবাদে টাউন হলে এক বিরাট সভা করিয়া তাঁহাদিগের মত সরকারের গোচর করেন। রামগোপালই এই আন্দোলনের নেতা মনে করিয়া ইংরাজরা তাঁহাকে এগ্রি-হর্টিকাল্‌চারাল সোসাইটীর সহকারী সভাপতির পদ হইতে বিতাড়িত করেন। রামগোপাল এক পুস্তিকায় এই চারিখানি আইনের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখান। বিস্ময়ের বিষয়, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দেও যেমন রাজকর্ম্মচারীদিগকে আইনের বলে রক্ষা করিবার চেষ্টায় এ দেশের লোকের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হইয়াছিল, বহু বর্ষ পরে—১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবে ওডয়ারের শাসনে অধিবাসিগণের উপর অত্যাচারের পর ভারত সরকার Indemnity আইন পাশ করিয়া কর্ম্মচারীদিগকে তেমনই অভয় দিয়াছিলেন :—বলা হইয়াছিল, যে সব কায "in good faith and in reasonable belief that they were necessary for maintaining or restoring order" করা হইয়াছে, সে সকলের জন্য কোন কর্ম্মচারীকে মামলা-সোপর্দ্দ করা যাইবে না। অথচ শৃঙ্খলা স্থাপন বা রক্ষার নামে এমন

কাযও রাজকর্ম্মচারীরা করিয়াছিলেন যে, সে সকলের সম্বন্ধে স্বয়ং ভারত-সচিব তাঁহার ডেসপ্যাচে লিখিয়াছিলেন :—

"The instances cited by the (Inquiry) Committee give justifiable ground for the assertion that the administration of martial law in the Punjab was marred by a spirit which prompted—not generally but unfortunately not uncommonly—the enforcement of punishments and orders calculated, if not intended, to humiliate Indians as a race, to cause unwarranted inconvenience amounting on occasion to injustice, and to flout the standards of propriety and humanity, which the inhabitants not only of India in particular but of the civilised world in general have a right to demand of those set in authority over them."

অর্থাৎ ভারত- সচিবই স্বীকার করেন যে, পঞ্জাবে রাজকর্ম্মচারীদিগের দ্বারা সামরিক আইনের বলে যে সব আদেশ প্রচারিত ও যে সব শাস্তি প্রদত্ত হইয়াছিল, সে সকলে ভারতবাসীদিগকে জাতি হিসাবে অপমানিত করা হইয়াছে, তাহাদিগের উপর অবিচার করা হইয়াছে এবং যে কোন সভ্য শাসকদিগের নিকট শাসিতরা যে ব্যবহার পাইবার দাবী করিতে পারে, সে ব্যবহারের আদর্শ অবজ্ঞা করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবাসীরা এই অপমানের ও অবিচারের জন্য অনাচারী কর্ম্মচারীদিগের বিরুদ্ধে ইংরাজের আদালতে বিচারপ্রার্থী হইবার অধিকারেও বঞ্চিত হইয়াছিল।

ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে—পরে তাহার বিষয়ে আরও আলোচনা করা প্রয়োজন হইবে।

এই সময় লর্ড ডালহৌসী ভারতের বড় লাট। তিনি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বড় লাট ছিলেন এবং তাঁহার শাসনকাল নানা কারণে ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসে স্মরণীয়। তাঁহার শাসনের ফলেই

ভারতে সিপাহী-বিদ্রোহ সম্ভব হইয়াছিল এবং সেই বিদ্রোহের পর রাজনীতিক অবস্থা-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। সে কথা বলিবার পূর্ব্বে তাঁহার শাসনে যে সব কার্য্যের ফলে জাতীয়তার প্রসার-সাধন সম্ভব হয়—যে সব কায দেশাত্মবোধের সহায় সেই সকলের উল্লেখ করিব। তিনি শাসনের সকল বিভাগেই স্বীয় প্রতিভার প্রভাব প্রসারিত করিয়াছিলেন। দেশে রাজপথ ও খাল বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসন কালেই ভারতবর্ষে প্রথম রেলপথ রচিত হয়। তিনি লোহিত সাগরের পথে বিলাতে বাষ্পীয় পোত গতায়াতের ব্যবস্থায় উৎসাহ দেন। তিনিই এ দেশে সুলভে ডাকের ব্যবস্থা করেন এবং তাঁহার সময়ে এ দেশে তারে সংবাদ পাঠাইবার উপায় হয়। এ সব দূরত্ব দূর করিয়া লোকের গতায়াতের ও সংবাদ আদান-প্রদানের বিশেষ সুবিধা করিয়া দেয়। ইহার ফলে দেশে রাজনীতি-চর্চ্চাও অধিক হইতে থাকে।

আবার তাঁহার শাসনের ফলেই এ দেশে সিপাহী-বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহের কারণ সন্ধান করিতে যাইয়া ভারতে বৃটিশের ঐতিহাসিক সার উইলিয়ম উইলশন হাণ্টার বলিয়াছেন, ভারতবাসীরা সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও বিশ্বাসযোগ্য হইলেও যে কোন উচ্চ রাজপদ তাঁহাদিগের অধিগম্য ছিল না, ইহাতে লোকের মনে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। তখন সব উচ্চ পদ মুষ্টিমেয় ইংরাজের অধিকৃত ছিল। বিদ্রোহের অল্প দিন পূর্ব্বে সার হেনরী লরেন্স বলিয়াছিলেন, সেনাদলে ভারতীয়রা কর্ম্মচারীর পদ লাভ করিতে পারেন না—সে সব পদ পাইলে তাঁহাদিগের সঙ্গত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইত। কিন্তু শিক্ষিত ভারতবাসীর সংখ্যা তখন বাঙ্গালা ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশে অধিক ছিল না; বিশেষ মুসলমানরা তখনও ইংরাজী শিক্ষা-লাভে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা ভারতে তাঁহাদিগের প্রভুত্বলোপে ক্ষুব্ধ হইয়া ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষিতরা প্রায়ই বিদ্রোহে

যোগ দেন নাই—কেবল যে সব হিন্দু রাজন্যের রাজ্য বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল, তাঁহারা, কেহ কেহ, প্রতিশোধ লইবার আগ্রহে, বিদ্রোহীর দলে যোগ দিয়াছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহ প্রধানতঃ মুসলমানদিগের লুপ্ত অধিকার উদ্ধারের চেষ্টা—দিল্লীতে বিদ্রোহীরা নামশেষ মোগলসম্রাট বাহাদুর শাহকেই দেওয়ানী খাসে তক্তে বসাইয়াছিল। কংগ্রেস স্থাপিত হইবার অল্পদিন পরে যখন সার অকল্যাণ্ড কলভিন প্রভৃতি ইংরাজ শাসকের প্রভাবে ও প্ররোচনায় মুসলমানদিগের মধ্যে অনেকে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করিতে থাকেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচারে' সে সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"সিপাহী-বিদ্রোহ যদি সফল হইত, তবে আজ দিল্লীতে মুসলমান বাদসাহ এবং লক্ষ্ণৌয়ে মুসলমান বাদসাহ রাজত্ব করিত।"

সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমানদিগের কংগ্রেস-বিরোধিতার মূল কারণও ইঙ্গিত করিয়াছিলেন—"তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন নহেন। বালকে কলের পুতুল লইয়া খেলা করে দেখিয়াছি ; সেগুলির কল টিপিলেই দাড়ি নাড়ে। শুনিতেছি, পাহাড়ে বসিয়া বড় বড় লোক নাকি কল টিপিতেছে, তাই ইঁহারা দাড়ি নাড়িতেছেন। কলের পুতুল, কলে দাড়ি নাড়িবে, তাহাতে আর আপত্তি কি ?"

সিপাহী-বিদ্রোহে সিপাহীরা ষড়যন্ত্রের ফলে বিদ্রোহী হইয়াছিল ; ইহা ইংরাজের ভারতীয় সমগ্র সেনাদলের বিদ্রোহ নহে। আর এই সময় যে বহু ভারতীয় হিন্দু ইংরাজকে আশ্রয় দিয়া—আপনারা বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা উপেক্ষা করিয়াও ইংরাজকে অভয় দিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কৌতূহলী পাঠক 'Native Fidelity' পুস্তকে তাহার পরিচয় পাইবেন। প্রকাশ, কৃষ্ণদাস পালই এই পুস্তকের লেখক।

আর আমাদিগের পূর্ব্বোল্লিখিত মতই যে অনেক বিদেশী গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার একটিমাত্র প্রমাণের উল্লেখ করিব। রুশ চিত্রকর ভেসিলী

ভারেষ্টেগিনের (Vassili Verestchagin) নাম সভ্য জগতে প্রসিদ্ধ। ম্যাডাম অলগা নভিকফ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—সাহিত্যে টলষ্টয় যাহা, চিত্রে ইনি তাহাই। ইঁহার অঙ্কিত "ভারতে যুবরাজ" চিত্র ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে রক্ষিত হইয়াছে। ইনি যুদ্ধের নগ্ন চিত্র চিত্রিত করিয়া সভ্য জগৎকে সংগ্রামবিমুখ করিবার সঙ্কল্প লইয়া বহু চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। সে সকলের মধ্যে একখানির নাম "An English Execution in India" অর্থাৎ ভারতে ইংরাজ কর্তৃক প্রাণনাশের একটি চিত্র। চিত্রখানিতে দেখা যায়, এক জন ভারতীয়কে ইংরাজ সৈনিকরা কামানের মুখে বাঁধিয়াছে—তাহাকে তোপে উড়াইয়া দেওয়া হইবে। বদ্ধ ব্যক্তির বেশ ও শ্মশ্রু দেখিলেই বুঝা যায়, সে মুসলমান। সিপাহী-বিদ্রোহে নৃশংসভাবে নির্য্যাতনপীড়িত ইংরাজরা সময় সময় যে ভাবে প্রতিহিংসাবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, এই চিত্রে তাহাই চিত্রিত হইয়াছে। ইহাতে এক দিকে বিদ্রোহের ফল, আর অপর দিকে সবলের প্রতিহিংসা সপ্রকাশ।

দেশব্যাপী অশান্তি ও অস্থিরতার মধ্যে রাজনীতিক আন্দোলন কখনও নিয়মানুগপথে অগ্রসর হইতে পারে না। সেই জন্য এই সময় বাঙ্গালায় রাজনীতিক আন্দোলন কিছু দিনের জন্য অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু সে বহু-দিনের জন্য নহে। সিপাহী-বিদ্রোহের অবসানে, দেশে শান্তি স্থাপিত হইলে, দেশের শাসন-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়—সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের অধিকারও স্বীকৃত হয়; ফলে নবোদ্যমে দেশে রাজনীতিক আন্দোলনের আরম্ভ হয়—সে আন্দোলনেও—এই নূতন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে—নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়।

——:o:——

দ্বিতীয় অধ্যায়

সিপাহী-বিদ্রোহের পর।

সিপাহী-বিদ্রোহ কালবৈশাখীর মত দেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গেল। বড়লাট নিযুক্ত হইয়া এ দেশে আসিবার সময় বিলাতে বিদায়-সম্বর্দ্ধনায় লর্ড ক্যানিং তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"আমি আমার শাসনকাল শান্তিময় দেখিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু এ কথাও আমি ভুলিতে পারি না যে, ভারতের বর্ত্তমান মেঘশূন্য গগনে একখানি ক্ষুদ্র মেঘ উত্থিত হইয়া ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া শেষে ধ্বংসের সম্ভাবনাশঙ্কা দেখাইতে পারে।' বাস্তবিক তাহাই হইয়াছিল। সিপাহী-বিদ্রোহ দমন করিতে যে ব্যয় হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ প্রায় ৬০ কোটি টাকা, আর বিদ্রোহফলে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ বাৰ্ষিক প্রায় ১৫ কোটি টাকা বাড়িয়া যায়। কিরূপে এই ব্যয়জনিত ঋণ ও বার্ষিক ব্যয় সঙ্কুলান হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য বিলাত হইতে বিশেষজ্ঞ জেমস উইলসনকে আনা হইল এবং তিনি শুল্কব্যবস্থার পরিবর্ত্তন, আয়কর প্রবর্ত্তন ও নোট প্রচলন ব্যবস্থা করিলেন।

ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন শেষ হইল এবং শাসনের দায়িত্ব বিলাতের রাণী গ্রহণ করিলেন। তিনি সেই ভার গ্রহণ করিয়া যে ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন তাহাতে উদার মত অভিব্যক্ত হইল। পরবর্ত্তীকালে কোন কোন ইংরাজ শাসক ও রাজনীতিক এই ঘোষণা রাজনীতিক দলিল ব্যতীত আর কিছুই নহে বলিয়া তাহার উক্তি বর্জ্জন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন বটে, কিন্তু রাণী ভিক্টোরিয়া যে স্বয়ং এই ঘোষণায় বিবৃত নীতি স্থির করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়, ইহা আইনেরই মত বলশালী করা

তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। এ দেশের লোকও এই ঘোষণাকে আপনাদিগের অধিকারের ছাড় বলিয়া বিবেচনা করিয়া আসিয়াছে। বিলাতের প্রজারা রাজা জনের নিকট হইতে বলপ্রদর্শনের ভয় দেখাইয়া অধিকারের যে ছাড় আদায় করিয়াছিল, তাহার নাম Magna Charta ; ইংরাজ ঐতিহাসিক হাণ্টার রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাকে সেই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ইহার মূল কথা—ন্যায় ও ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে সহিষ্ণুতাই শাসনের বৈশিষ্ট্য হইবে। এ দেশের লোককে উচ্চরাজপদ প্রদান-বিরতিকে হাণ্টার বিদ্রোহের অন্যতম কারণ বলিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বে—১৮৩৩ খৃষ্টাব্দেও Act of William IVএ লিখিত হইয়াছিল, সকল পদেই ভারতবাসীর অধিকার থাকিবে :—

"And be it enacted, that no native of the said territories, nor any natural born subject of His Majesty resident therein, shall by reason only of his religion, place of birth, descent, colour or any of them, be disabled from holding any place, office, or employment under the Company."

কিন্তু এই উক্তি অনুসারে কায হয় নাই। রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায় সেই উক্তির পুনরুক্তিতে লোক আশ্বস্ত হয় :—

"It is Our further will that, so far as may be, Our Subjects of whatever Race or Creed, be freely and impartially admitted to Offices in our Service, the Duties of which they may be qualified, by their education, ability, and integrity duly to discharge."

এই ঘোষনায় বলা হয়—প্রজার উন্নতি ও সন্তোষই শাসনের পুরস্কার বলিয়া বিবেচিত হইবে।

যদিও ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মেজর ইভান্স বেল লিখিয়াছিলেন, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কেবল এক জন হিন্দু ব্যবহারাজীবকে কলিকাতা হাই-কোর্টের বিচারক নিযুক্ত করা হইয়াছে সুতরাং, "The fair promise of 1862,—when High Courts and Legislative Councils were constituted—has blossomed with very scanty performance" তথাপি ঘোষণা প্রচারকালে তাহাতে ভারতবাসীর মনে আশার সঞ্চার হইয়াছিল। আবার সেই সময় বিদ্যাবিস্তারকল্পে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইংরাজী শিক্ষাবিস্তার ঘটিতে থাকে।

এই শিক্ষা যেমন ভারতবাসীর রাজনীতিক অধিকারবোধ দৃঢ় করিতে লাগিল, অধিকারের অভাব তেমনই লোকের মনে বিক্ষোভ উৎপন্ন করিতে লাগিল। বাঙ্গালায় এই বিক্ষোভের বিকাশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া প্রায় ৫০ বৎসর পরে বাঙ্গালা হইতে জাতীয় আন্দোলনের নূতন প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল, তেমনই নীলকর ইংরাজদিগের অনাচারের প্রতিবাদে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সেই আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। নীলকরদিগের বিরুদ্ধে বাঙ্গালার প্রজাসাধারণের বিদ্রোহ ঘোষণা ভারতবর্ষের রাজনীতিক গতি ও উন্নতির ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাহার প্রাদেশিকতা তাহার গুরুত্ব ক্ষুন্ন করিতে পারে না। তখন বিহারও বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত এবং বিহারেও নীলের চাষ হইত কিন্তু বাঙ্গালার প্রজারাই অনাচারের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ ও নিষ্ক্রীয় প্রতিরোধ-অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। তখন বাঙ্গালার ও ভারতবর্ষের অর্থনীতিক ব্যাপারে নীলের গুরুত্ব অল্প নহে। ১৮৫৮৫৯ খৃষ্টাব্দের হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উৎপন্ন নীলের পরিমাণ এইরূপ দেখা যায়:—

	মণ
উত্তর পশ্চিম (বর্ত্তমান যুক্ত) প্রদেশ···	২১,৬৪৩
বিহার···	৩২,৬৯৯

বাঙ্গালা···	৪০,৭৬৩
অন্যান্য স্থান···	১০,৯৮২
মোট······	১,০৬,০৮৭

সুতরাং দেখা যায়, মোট উৎপন্ন নীলের প্রায় ৩৮ ভাগ বাঙ্গালায় উৎপন্ন হইত। ইহা বিদেশে রপ্তানী হইত এবং বাঙ্গালা হইতে প্রতি বৎসর রপ্তানী নীলের মূল্য প্রায় ৩ কোটি টাকা ছিল।

ইংরাজ নীলকররা "রাজার জাতি" বলিয়া প্রজাকে নীলের চাষ করাইতে ও অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্য দিতে চাহিতেন। সেই কারণে, সঙ্গে সঙ্গে, আরও নানা অনাচার হইত। যাঁহাদিগের নীলহাঙ্গামার বিস্তৃত বিবরণ সরকারী রিপোর্টে পাঠ করিবার সুবিধা নাই, তাঁহারা দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের অমর কীর্ত্তি 'নীল দর্পণ' নাটকখানি পাঠ করিবেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাঙ্গালায় বৎসরে প্রায় ৪০,৭৬৩ মণ নীল উৎপন্ন হইত। যে সব স্থানে প্রজারা অনাচারে উত্যক্ত হইয়া বলে "হাত কাটিয়া ফেলিলেও নীল বুনিব না" সে সকল জিলার নাম ও সেই সব জিলার বার্ষিক উৎপন্ন নীলের হিসাব এইরূপ ছিল :—

জিলা	মণ
যশোহর···	৮,৬৩৫
নদীয়া···	৮,০২৩
মুর্শিদাবাদ···	৪,৯১২
রাজসাহী···	৩,৫১২
মালদহ···	২,৭৭৭
ফরিদপুর···	১,৪৮৮
মোট······	২৯,৩৪৭

এই নীলের চাষে ও নীল উৎপাদনের কার্য্যে যে বহু লোকের অন্নসংস্থান হইত, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু বাঙ্গালার লোক মানকে অর্থ অপেক্ষা অধিক আদর করিতে শিখিয়াছে, তাহারা অন্যায় ও অনাচার সহ্য করিতে অসম্মত। সেই জন্যই তাহারা নীলের চাষ করিতে অস্বীকার করে।

এক দিকে অর্থশালী, রাজার জাতি, শ্বেতাঙ্গ নীলকর—আর এক দিকে বাঙ্গালার প্রজা। বাঙ্গালার প্রজারা যখন নীলকরদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তখন ইংরাজ লেখকরা তাহাদিগকে কিরূপ বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় তৎকালে প্রকাশিত বহু পুস্তিকায় ও ইংরাজ-পরিচালিত সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। এ দিকে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তখন প্রজার পক্ষাবলম্বন করেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্র তখন তাঁহারই মত সরকারী কর্ম্মচারী গিরিশচন্দ্র ঘোষের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া তিনি পরিচালিত করিতেছেন। তাঁহার মৃত্যুর অল্পদিন পরে "ধীরাজ" গান রচনা করিয়াছিলেন,ঃ—

"নীল বাঁদরে সোণার বাঙ্গলা করলে এ বার ছারেখার।
অসময়ে হরিশ ম'ল লঙের হল কারাগার।
প্রজার এ বার প্রাণ বাঁচান ভার॥"

আর তাঁহার মৃত্যুর বহুদিন পরে বাঙ্গালা সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ইংরাজ সিভিলিয়ান বাকল্যাণ্ড তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ঃ—

"When the quarrel between the raiyats of the indigo districts and the planters was running high, he espoused the cause of the former, depicting in vivid colours their grievances and sufferings. He thus braved the wrath of the whole planting interest, who had their advocates in the Press and in the non-official European community of Calcutta."

বাকল্যাণ্ডের এই কথাতেই স্বীকৃত হইয়াছে, নীলকররা যাহাই কেন করুন না, কলিকাতার বেসরকারী য়ুরোপীয়রা তাঁহাদিগের সমর্থক ছিলেন।

এক দিকে হরিশ্চন্দ্রের প্রবন্ধ, আর এক দিকে দীনবন্ধুর রচিত 'নীলদর্পণ' নাটক—প্রজার দুর্দ্দশা-দুঃখ ব্যক্ত করিল।

তখন বাঙ্গালার প্রজারা কিরূপে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অহিংস অসযোগ নীতি পরিচালিত করিয়াছিল, তাহার প্রমাণে আমরা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে তৎকালীন ছোটলাট সার জন পিটার গ্রাণ্টের 'মিনিট' হইতে উদ্ধৃত বিবরণ প্রদান করিতেছি :—

"আমি যমুনা নদীর তীরবর্ত্তী সিরাজগঞ্জ হইতে কেবল ফিরিয়া আসিতেছি। আমি ঢাকার রেলপথ সংক্রান্ত ব্যাপারের জন্য তথায় গিয়াছিলাম—নীলের ব্যাপারের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। মাথা-ভাঙ্গা নদী হইয়া গঙ্গায় পতিত হইয়া, যাওয়াই আমার অভিপ্রেত ছিল; কিন্তু কুমার নদীতে পৌঁছিয়া যখন দেখিতে পাইলাম, অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব পথে যাওয়া যায়, তখন কুমার ও কালীগঙ্গা নদীপথেই অগ্রসর হই। এই দুইটি নদী নদীয়া ও যশোহর এবং পাবনা জিলার কতকাংশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। নানা স্থানে প্রজারা উপস্থিত ছিল। তাহাদিগের একমাত্র প্রার্থনা---সরকার আদেশ প্রচার করুন, তাহাদিগকে নীলের চাষ করিতে হইবে না। ঐ দুই নদীপথে যখন আমি প্রত্যাবর্ত্তন করি, তখন উষাকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত---আমার ষ্টীমার যখন ৬০।৭০ মাইল অতিক্রম করে, সেই সময় নদীর উভয় কূল জনগণে পরিপূর্ণ ছিল। তাহারা এ বিষয়ে সুবিচার চাহিতেছিল। নদীতীরবর্ত্তী গ্রামসমূহের স্ত্রীলোকরাও স্বতন্ত্র দলে উপস্থিত ছিল। যে সব পুরুষ গ্রামে ও দুইটি গ্রামের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত ছিল, তাহারা নিশ্চয়ই উভয় কূলের দূরস্থ গ্রামসমূহ হইতেও আসিয়াছিল। ভারতে সরকারের কোন কর্ম্মচারী যে কখন ১৪ ঘণ্টা কাল এইরূপ বিচারপ্রার্থী

জনতার মধ্য দিয়া ষ্টীমারে গমন করিয়াছেন, তাহা আমার মনে হয় না। ইহারা সকলেই শৃঙ্খলাসম্পন্ন ও সম্ভ্রমশীল; কিন্তু ইহাদিগের আন্তরিকতা অসাধারণ। লক্ষ লক্ষ নরনারীশিশুর এইরূপ কার্য্য যে অর্থহীন ইহা মনে করা নির্ব্বোধের কার্য্য হইবে। ইহার বিশেষ অর্থ আছে। স্বয়ং দলবদ্ধ হইয়া কায করিবার এই যে ক্ষমতা ইহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখাই সঙ্গত (The organization and capacity for combined and simultaneous action in the cause, which this remarkable demonstration over so large an extent of country proved, are subjects worthy of much consideration)"

গান্ধীজীর প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ইহার ৬০ বৎসর পরের ঘটনা।

এই নীল আন্দোলনকে ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের পূর্ব্বগামী বলা যাইতে পারে। জার্ম্মাণী যখন কৃত্রিম নীল প্রস্তুত করিয়া স্বাভাবিক নীলের ব্যবসা নষ্ট করে, তখন বাঙ্গালীর আন্দোলনফলে ভারতবর্ষে নীলের চাষ সঙ্কুচিত হইয়াছে এবং তাহাতেই সে ব্যবসার বিনাশ সহজসাধ্য হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে। বিহারের চম্পারণে গান্ধীজীর আন্দোলন গণ-আন্দোলন নহে, তাহাতে তাঁহার প্রভাবই সপ্রকাশ। ইলবার্ট বিলের আন্দোলনকালে যেমন ইংরাজের ও ভারতবাসীর মতে প্রবল সঙ্ঘর্ষ হইয়াছিল, নীল আন্দোলনেও তাহাই হইয়াছিল। বাঙ্গালীর গণ-আন্দোলন সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনকালে যেমন বাঙ্গালী তাহার আন্দোলনে জয়ী হইয়াছিল—নীল আন্দোলনেও তেমনই। সেই সময় বাঙ্গালার প্রজা-সাধারণের আন্দোলন সম্বন্ধে বড়লাট লর্ড ক্যানিং লিখিয়াছিলেন, "(এই ব্যাপারে) আমি সপ্তাহ কাল যে উৎকণ্ঠা ভোগ করিয়াছি দিল্লীর (অর্থাৎ সিপাহী-বিদ্রোহের) ব্যাপারের পর আর কখনও সেরূপ উৎকণ্ঠা ভোগ করি নাই। আমি বুঝিয়াছিলাম, কোন নির্ব্বোধ নীলকর যদি ক্রোধবশে বা

ভীত হইয়া একবার গুলী চালায়, তবে তাহাতে নিম্নবঙ্গে সমস্ত নীল কুঠীতে অগ্নিশিখা দেখা দিতে পারে।"

কিন্তু লর্ড ক্যানিং যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অনাচারে ও অত্যাচারে বাঙ্গালী ধৈর্য্য হারায় নাই—সংযম বর্জ্জন করে নাই; সে আপনার সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকিয়া বিশ্বাস রাখিয়াছিল—ন্যায়ের জয় হইবেই। এই ভাবই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রকাশ পাইয়াছিল; এই ভাবের অভাব ঘটিলে সেই আন্দোলনকালে ফুলারের শাসনে যখন বরিশালে প্রাদেশিক সম্মিলন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়—গুর্খার প্রহারে জর্জ্জরিত বাঙ্গালী বালকের শোণিতে বাঙ্গালার ভূমি রঞ্জিত হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালায় আয়ার্লণ্ড রচনার সম্ভাবনা ঘটিত। আইরিশ নেতা পার্ণেল বলিয়াছিলেন, যদি তাঁহাকে বন্দী করা হয়, তবে আয়ার্লণ্ডে অনাচার চণ্ডলীলায় প্রবৃত্ত হইবে— His place would be taken by Captain Moonlight. হইয়াছিল ও তাহাই। কিন্তু বাঙ্গালার নেতারা কখন মনে করেন, নাই তাঁহাদিগের অভাবে দেশ বিশৃঙ্খলায় বিপন্ন হইবে। এমন কি গান্ধীজী যেমন "If I am arrested" লিখিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, বাঙ্গালায় তাহারও প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। বাঙ্গালা কেন্দ্র-চ্যুত হয় নাই। পার্ণেলই প্রতীচীতে "বয়কটের" প্রবর্ত্তক। কিন্তু বাঙ্গালায় "একঘরে করা"—নূতন নহে। আর জয়ের উল্লাসও কখন বাঙ্গালীকে অসংযত করে নাই। ইহা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে জয়ের সময় বিশেষরূপেই লক্ষিত হইয়াছিল। লর্ড মর্লি ভারত-সচিবরূপে বলিয়াছিলেন, বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না। বাঙ্গালী তাহার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া-ছিল। বঙ্গভঙ্গে ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর ভাব লক্ষ্য করিয়া যুবরাজ (বর্ত্তমান সম্রাট) বাঙ্গালীর আপত্তিকর ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পরামর্শ দিয়াছি-লেন। তিনি বর্ত্তমান লেখককে বলিয়াছিলেন, "I found no reason

why the sentiments of a people like the Bengalees should not be respected."

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন-কালে বাঙ্গালীকে যে লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা যখন বিবেচনা করা যায়—বেত্রাঘাত, কারাদণ্ড, নির্ব্বাসন, এ সব যখন স্মরণ করা যায়, তখন কি বলিতে হয় না, লর্ড মর্লির উক্তি ব্যর্থ হইবার পর পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব্ব বঙ্গ সম্মিলনের সংবাদ ঘোষণার পর যে বাঙ্গালায় কোথাও উল্লাস উৎকট ভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই, ইহা বিশেষ বিস্ময়কর? আর বুয়র যুদ্ধে জয়ের পর জয়ের উৎসবে ইংরেজের ব্যবহার কিরূপ হইয়াছিল? সে উল্লাস ইংরাজকে যেরূপে সংযমহীন করিয়াছিল, তাহা মনে করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। যে দিন এক দল সৈনিক প্রত্যাবর্ত্তন করে, সে দিন লণ্ডনে উৎসব দেখিয়া প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ষ্টেড বায়রণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—জাতি রক্তপানে মত্ত হইয়া পাপাত্মক অপরাধ বমন করিয়াছে। উৎসবাবসানে রাজপথ হইতে সংগৃহীত আহত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা—১১ শত। সে রাত্রিতে রাজপথে কোন নারী নিরাপদ ছিল না। যখন রাত্রির অন্ধকার চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল, তখন যাহা ঘটিল, তাহার বর্ণনা আমরা ষ্টেডের রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"Then the brute latent in every human breast asserted himself with the supreme disregard of all the conventions with which centuries of civilisation have draped his nether-limbs...The scenes that were witnessed, the sounds that were heard in the long hours between sunset and mid-night, have been hinted at by many scandalised beholders, but no publication would reproduce, whether with the aid of phonograph or photograph, the foulness that reigned supreme. 'A daughter', says Mr. Walkley, 'was torn shrieking from her father's arms, and kissed in succession by half a dozen ruffians who stood waiting for

their prey. Any good looking girl without an •escort was seized and kissed and passed from hand to hand for similar treatment, utterly regardless of her protests. ...Such si London civilization at the end of the 19th century! Such are the citizens whom our proud democracy breeds in the heart of the empire, and is sitill breeding."

যে সেনাদলের সম্বর্দ্ধনায় এই ঘটনা ঘটিয়াছিল—তাহাদিগের মধ্যে মাত্র ১০ জন যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিল। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাঙ্গালীর আন্দোলনে বাঙ্গালীর ত্যাগ কি ইহার তুলনায় অনেক অধিক নহে? কিন্তু বাঙ্গালা জয়ে আত্মবিস্মৃত হয় নাই। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থাপনের ফলে বাঙ্গালার একটি



কৃষ্ণদাস পাল

রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের অভাব দূর হইল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদাস পাল এ

সভার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। বলা বাহুল্য, যে সব প্রতিষ্ঠানে সম্পাদক অবৈতনিকরূপে কায করেন, সে সকলে অনেক কাযের ভারই প্রধানতঃ সহকারীর উপর অর্পিত হয়। এ দিকে হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর 'হিন্দু পেট্রিয়টের' অধিকারী কিছুদিন ক্ষতি স্বীকার করিয়া উহা পরিচালনের পর উহার ভার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উপর ন্যস্ত করিলে তিনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদাসকে উহার সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া পত্রখানি ট্রাষ্ট বা ন্যাসে পরিণত করেন। 'বেঙ্গলী' গিরিশ্চন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। তখন দেশের অধিকাংশ প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীই বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সদস্য ছিলেন এবং সভা তাঁহাদিগের দ্বারা পরিচালিত হইত।

এই সময় দেশের শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের প্রাদুর্ভাব-পরিচয় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন স্মৃতিতে' দিয়াছেন। যে সময় "হিন্দু মেলা" প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ বা সেইরূপ সময়ের কথায় তিনি লিখিয়াছেন :—

"জ্যোতি দাদার (জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের) উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল। বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকের সভা। * * স্বদেশে দিয়াশালাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। খবর পাওয়া গেল একটি কোন অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত; গেলাম তাহার কল দেখিতে। * * যন্ত্র তৈরি করিতে কিছু দেনা হইয়াছিল, আমরা তাহা শোধ করিয়া দিলাম। ছেলেবেলায় রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। * * * দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ, সে তাঁহার সেই তেজের জিনিষ। দেশের সমস্ত খর্ব্বতা, দীনতা, অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহি-

তেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি ধরিতেন—গলায়



রাজনারায়ণ বসু

সুর লাগুক্ আর না লাগুক্ সে তিনি খেয়ালই করিতেন না,-

'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।'

রাজনারায়ণ বাবুর এই দেশপ্রেম তাঁহার জীবনের সায়াহ্ন পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাঁহার সহিত যখন বর্ত্তমান লেখকের পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটে, তখন তিনি বৃদ্ধ—দেওঘরে বাস করেন। সেই পরিচয়-সূত্রে আমরা যখন ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী নববর্ষে তাঁহাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করি, তখন "ক্ষীণতা প্রযুক্ত অধিক লিখিতে পারিলাম না" লিখিয়াও তিনি লিখিয়াছিলেন:—

"তোমাদিগের উদ্দিষ্ট উপহার পাইয়া বাধিত হইলাম কিন্তু নববর্ষের অভিবাদন এখন করিব না, ১লা বৈশাখ (যদি ততদিন বাঁচিয়া থাকি) করিব। ঐ দিনের জন্য * * বাঙ্গালা ক্ষুদ্র কবিতাযুক্ত উল্লিখিত উপহারের ন্যায় উৎকৃষ্ট উপহার দ্রব্য কি প্রস্তুত করাইতে পার না? কত কাল আমরা ইংরাজ থাকিব?"—ইত্যাদি

ইহার পর "হিন্দু মেলা" প্রতিষ্ঠার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন:—

"বাহির হইতে দেখিতে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশী প্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। * * আমাদের বাড়ীতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরাজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকট তখনি ফিরিয়া আসিয়াছিল।

"আমাদের বাড়ির সাহায্যে 'হিন্দু মেলা' বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় সেই মেলার কর্ম্মকর্ত্তারূপে নিয়োজিত

ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই—প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত 'মিলে সব ভারত সন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্পব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।"

"হিন্দুমেলা" সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, তিনি যখন মেদিনীপুরে ছিলেন, সেই সময় যে "জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার" প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করিয়া নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের মনে "হিন্দু মেলার" কল্পনা সমুদিত হয়। তবে মেলার কল্পনা মিত্র মহাশয়ের। "জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা" সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন—

"হাইকোর্টের জজ শম্ভূনাথ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে যদি উক্ত সভা সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে তিনি তাহার সভাপতি হইবেন। ঐ পুস্তিকা (সভার অনুষ্ঠান পত্র—Prospectus of a Society for the Promotion of National Feeling among the educated Natives of Bengal) হইতে বান্ধববর নবগোপাল মিত্র হিন্দু মেলার ভাব পান। তিনি ঐ মেলা ও তৎপরে জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন।"

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম "হিন্দু মেলার" অনুষ্ঠান হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে যে মেলা হয়, তাহাতে রাজনারায়ণ বাবু সভাপতি হইয়াছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'আমার বাল্যকথায়' লিখিয়াছেন :—

"আমি বোম্বায়ে কার্য্যারম্ভ করবার কিছু পরে কলিকাতায় এক 'স্বদেশী' মেলা প্রবর্ত্তিত হয়। বড় দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে মেলার সূত্রপাত করেন, পরে মেজ দাদা (গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর) তাহাতে যোগদান করায় প্রকৃতপক্ষে তার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হ'ল। কলিকাতার

প্রান্তবর্ত্তী কোন একটি উদ্যানে বৎসর বৎসর তিন চারি দিন ধরে এই মেলা চল্‌তো। সেখানে দেশী জিনিসের প্রদর্শনী, জাতীয় সঙ্গীত, বক্তৃতাদি বিবিধ উপায়ে লোকের দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করবার চেষ্টা করা হ'ত। এই মেলা উপলক্ষে মেজদাদা কতকগুলি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন, আর সেই মেলাই আমার ভারত সঙ্গীতের জন্মদাতা—

মিলে সব ভারত সন্তান
একতান মনঃ প্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।"

এই মেলাটি প্রথমে "চৈত্র মেলা" নামে অভিহিত হইয়া পরে "হিন্দু-মেলা" নাম লাভ করে।

মেলা ভারতবর্ষে প্রচলিত জনগণের অনুষ্ঠান। নানা কারণে, নানা উপলক্ষে, নানা স্থানে মেলা হইয়া থাকে। তবে প্রধানতঃ তীর্থস্থান বাছিয়া মেলার অনুষ্ঠান হয়। মেলায় যেমন পণ্য দ্রব্য বিক্রয় হয়, তেমনই ভাবের আদান-প্রদানও হয়। কুম্ভ মেলা হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র ভারতে অসংখ্য মেলা হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই যে প্রতিষ্ঠানটি আমাদিগের সুপরিচিত এবং আমাদিগের সাধারণ জীবনের সহিত সম্বদ্ধ বলা যায়, তাহাকে রাজনীতিক প্রয়োজনে ব্যবহার করিবার এই যে কল্পনা ইহা অসাধারণ বলিতে হয়। "হিন্দু মেলা" বিলুপ্ত হইবার পর—রাজনীতিক সভাসমিতি যখন তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে, তখন 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র প্রবর্ত্তক শিশির কুমার ঘোষ মেলার পুনঃপ্রবর্ত্তন দ্বারা দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগণকে একই ভাবে অনুপ্রাণিত ও একই ক্ষেত্রে সম্মিলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। "হিন্দু মেলা"কে এক হিসাবে কংগ্রেসের পূর্ব্ববর্ত্তী বলা যায়। তবে ইহার নামেই প্রকাশ—ইহার প্রবর্ত্তকরা ও পরিচালকরা হিন্দু এবং ইহা বাঙ্গালার প্রতিষ্ঠান ছিল।

এই মেলার দুষ্প্রাপ্য কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, তখন দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের জন্য বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে অসাধারণ উৎসাহ ও আগ্রহ লক্ষিত হইয়াছিল।



শিশিরকুমার ঘোষ

এই "চৈত্র মেলার উদ্দেশ্য" ইহার দ্বিতীয় অধিবেশনে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত হয়। তাহা এইরূপ :—

"এই চৈত্র মেলার তত্ত্বাবধারকগণ এই মেলার উদ্দেশ্য বিবৃত করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন এবং তজ্জন্যই আমি আপনাকে এই

কর্ম্মের অনুপযুক্ত মনে করিয়াও তাঁহাদের অনুরোধে যথাসাধ্য ইহার উদ্দেশ্য প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা। এইরূপ একত্র হওয়ার ফল যদ্যপি আপাততঃ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কিন্তু আমাদের পরস্পরের মিলন এবং একত্র হওয়া যে কত আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কত উপকারী তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচর নাই। এক দিনে কোন এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখা শুনা হওয়াতে অনেক মহৎ কর্ম্ম সাধন, অনেক উৎসাহ বৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে, যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা হিন্দু মেলা ও ইহা হিন্দুদিগেরই জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য নহে, কোন বিষয়সুখের জন্য নহে, কোন আমোদপ্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারতভূমির জন্য।



গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

"ইহার আরো একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর। এই আত্মনির্ভর ইংরাজ জাতির একটি প্রধান গুণ। আমরা এই গুণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আপনার চেষ্টায় মহৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া, এবং তাহা সফল করাকেই আত্মনির্ভর কহে। ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব, আমাদের সকল কর্ম্মেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাজ্ঞা করি, ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়? কেন, আমরা কি মনুষ্য নহি? মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া চিরকাল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে; অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়---ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। স্বদেশের হিতসাধন জন্য পরের সাহায্য না চাহিয়া যাহাতে আমরা আপনারাই তাহা সাধন করিতে পারি এই ইহার প্রকৃত ও প্রধান উদ্দেশ্য।

"এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য আমাদের স্বদেশীয় কতিপয় ভদ্র মান্য ব্যক্তি এই মেলার কোন না কোন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। একতা নিবন্ধন, স্বদেশানুরাগবর্দ্ধন ও স্বদেশের প্রকৃত উন্নতির পথ নির্দ্দেশ জন্য মণ্ডলী সকল সংস্থাপিত হইয়াছে, কেহ কেহ দেশের প্রকৃত উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছেন; কেহ কেহ যাহাতে ভারত যুবকযুবতী বিদ্যা-ভূষণে ভূষিত হয় তাহার জন্য যত্নশীল হইয়া সেই ভার গ্রহণ করিয়াছেন; বিদ্যা এবং জ্ঞান আমরা যেখান হইতে পাই তাহা লইতে কুণ্ঠিত হইব না, কেহ কেহ এই বিদ্যার ফল-স্বরূপ শিল্পজাত নানাবিধ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষীয় লোকগণের তৎ তৎ বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহার প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কেহ কেহ হৃদয়ের প্রকৃত স্বর যে সংগীত—সেই সংগীত বিদ্যার উন্নতি সাধনে ঐকান্তিক যত্ন করিতেছেন, কেহ কেহ বা আমাদের শারীরিক দুর্ব্বলতা মোচন জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন, কেহ কেহ বা এই মেলার জন্য সংগৃহীত অর্থ যাহাতে মেলারি নিমিত্ত ব্যয় হয় তৎপ্রতি

দৃষ্টি রাখিতেছেন। যখন আমাদের সকলেরি এরূপ যত্ন, তখন আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে এই কর্ম্ম, এই উদ্দেশ্য সফল হইবেই হইবে; কিন্তু নিরুৎসাহের কর্ম্ম নহে এবং সেই উৎসাহের জন্যই সিদ্ধিদাতা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম, ইতি।"

১৭৮৯ শকাব্দে ৩০শে চৈত্র শনিবার কলিকাতায় আশুতোষ দেবের বেলগেছিয়ার উদ্যানে যখন এই উদ্দেশ্য বিবৃত হয় তখন self-determination কথা প্রচলিত হয় নাই। বাঙ্গালার শিক্ষিত হিন্দু সমাজ তখন স্বাবলম্বনের সাধনা ত্যাগ করিয়া পরমুখাপেক্ষী হওয়া লজ্জাজনক বলিয়া বিবেচনা করেন। পরবশ্যতা তাঁহারা ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করিতেই চাহেন।

এই মত "চৈত্র মেলার" এই অধিবেশনেই মনোমোহন বসুর বক্তৃতায় আরও সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। তিনি বলেন:—

"স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে এই বোধ হয়, আজ আমরা একটি অভিনব আনন্দ বাজারে উপস্থিত হইয়াছি। সারল্য আর নির্ম্মৎসরতা আমাদের মূলধন, তদ্বিনিময়ে ঐক্যনামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। সেই বীজ স্বদেশক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্নবারি এবং উপযুক্ত উৎসাহ-তাপ প্রাপ্ত হইলেই একটি মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক। এত মনোহর হইবে যে যখন জাতি-গৌরবরূপ তাহার নব পত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্য পুষ্প বিকশিত হইবে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারতভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে। তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে 'স্বাধীনতা' নাম দিয়া তাহার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা সে ফল কখন দেখি নাই, কেবল জনশ্রুতিতে তাহার অনুপম গুণগ্রামের কথামাত্র শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের অবলম্বিত অধ্যবসায় থাকিলে অন্ততঃ 'স্বাবলম্বন' নামা মধুর ফলের আস্বাদনেও বঞ্চিত হইব না। ফলতঃ একতাই

সেই মিলন সাধনের একমাত্র উপায় এবং অদ্যকার এই সমাবেশরূপ অনুষ্ঠান যে সেই ঐক্য স্থাপনের অদ্বিতীয় সাধন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।"

কংগ্রেস কত দিনে এই আদর্শের সন্নিকটস্থ হইতে পারিয়াছে, তাহা বিবেচনার বিষয় সন্দেহ নাই।

মেলার বৈশিষ্ট্য বিষয়ে মনোমোহন বাবু বলেন :—

"ইহাতে অধিক আহ্লাদের বিষয় এই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হওয়াবধি এ দেশে যতকিছু উত্তম বিষয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছে, প্রায় রাজপুরুষরা অথবা অপরাপর ইংরাজ মহাত্মারাই তাহার প্রথম উত্তেজক এবং প্রধান প্রবর্ত্তক। কিন্তু এই চৈত্র মেলা নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, ইহাতে ইউরোপীয়দিগের নাম গন্ধ মাত্র নাই, এবং যে সকল দ্রব্য সামগ্রী প্রদর্শিত হইবে, তাহাও স্বদেশীয় ক্ষেত্র, স্বদেশীয় উদ্যান, স্বদেশীয় ভূগর্ভ, স্বদেশীয় শিল্প, এবং স্বদেশীয় জনগণের হস্তসম্ভূত। স্বজাতির উন্নতি সাধন, ঐক্য স্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের চেষ্টা করাই এই সমাবেশের একমাত্র পবিত্র উদ্দেশ্য।"

১২৮০ বঙ্গাব্দে (অর্থাৎ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে) যখন বারুইপুরে "হিন্দু মেলা"র অধিবেশন হয়, তখন এই মনোমোহন বসুই দেশের অর্থনীতিক দুর্দ্দশা বর্ণনা করিয়া একটি গান রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল :—

"তাঁতি কামার সবার অন্ন মেলা ভার, করে হাহাকার
এ দুখে আর কে করে পার ?
ঐ ভাই আজ যদি ইংরেজ রাজা ছেড়ে যায় ভারত প্রজা,
দশা হবে কি ?
তখন থান বিনে লজ্জা শরম কিসে রয় ?

* * * * *

ঘরে প্রদীপটি জ্বাল্‌তে হলে বিলিতি বাক্‌স খুলে
জ্বালতে হয় গো হয় !
আবার বিলিতি ছুঁচ সূতো বই শেলাই নয়।'

এই গানটিই পরে সংস্কৃত করিয়া "দিনের দিন সবে দীন" গীতে পরিণত করা হয়। সেই গানে এ দেশের লোকের বর্ণনা—"অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অপমানে তনু ক্ষীণ।"—দেশে

তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার
সূতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার—
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর,
হলো দেশের কি দুর্দ্দিন!

* * * *

ছুঁই সূতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে,
দিয়াশলাই কাটি—তাও আসে পোতে ;
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে—
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।"

" চৈত্র মেলা " (পরে " হিন্দু মেলা") দেশের রাজনীতিক জীবনে যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তাহা বলা বাহুল্য। সে জন্য আমরা নিম্নে উহার দ্বিতীয় বর্ষের বিবরণ হইতে ভূমিকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

'গত বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে এই মেলা প্রথম সংস্থাপিত হয়. দেশীয় লোকের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন এবং দেশীয় লোক দ্বারা স্বদেশীয় সৎকার্য্য সাধন করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই বৎসরের মেলার কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তজ্জন্য কলিকাতাস্থ ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা যায় এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাব সাধারণ মধ্যে প্রচার করা হয়।

"১৭৮৮ সালের চৈত্রসংক্রান্তিতে যে একটি জাতীয় মেলা হইয়াছিল, স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতি সম্পাদন করাই তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু যদি এই জাতীয় মেলার

উৎসাহ কেবল ক্ষণকালের নিমিত্ত হয় এবং অস্মদ্দেশীয়দিগের মধ্যে সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের এই বিষয়ে একটি অটল উৎসাহ ও যত্ন স্থাপনের উপায় না করা হয়, তাহা হইলে আমাদিগের এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ-রূপে সফল হইবার ব্যতিক্রম ঘটিবে। এই অভিপ্রায়ে আমাদিগের দেশীয় কতিপয় ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে উদ্‌যোগী হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে এবং স্বদেশের বিশেষ বিশেষ উন্নতি-সাধক কার্য্য সংসাধন জন্য বিশেষ বিশেষ মণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধন করিয়া সাধারণ কার্য্যের প্রতি যত্ন করিবেন। যেরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

১। এই মেলাভুক্ত একটি সাধারণ মণ্ডলী সংস্থাপিত হইবে। তাঁহারা সমুদায় হিন্দু জাতিকে উপরোক্ত কার্য্য সকল সংসাধন জন্য এক দলে অভিভুক্ত এবং স্বদেশীয় লোকগণ মধ্যে পরস্পরের বিদ্বেষভাব উন্মূলন করিয়া উপরোক্ত সাধারণ কার্য্যে নিয়োগ করত এই জাতীয় মেলার গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

২। প্রত্যেক বৎসরে আমাদিগের হিন্দু সমাজের কতদূর উন্নতি হইল, এই বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ জন্য চৈত্রসংক্রান্তিতে সাধারণের সমক্ষে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পাঠ করা হইবে।

৩। অস্মদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তি স্বজাতীয় বিদ্যানুশীলনের উন্নতি সাধনে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করা যাইবে।

৪। প্রতি মেলায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীয় লোকের পরি-শ্রম ও শিল্পজাত দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া প্রদর্শিত হইবে।

৫। প্রতি মেলায় স্বদেশীয় সঙ্গীতনিপুণ ব্যক্তিগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করা যাইবে।

৬। যাঁহারা মল্ল-বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, প্রতি মেলায় তাঁহাদিগকে একত্রিত করিয়া উপযুক্ত পারিতোষিক বা সম্মান

প্রদান করা যাইবে এবং স্বদেশীয় লোক মধ্যে ব্যায়ামশিক্ষা প্রচলিত করিতে হইবে।

"এই সকল কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত টাকা সংগৃহীত হইতেছে। যাঁহারা এই সকল কার্য্যকে স্বদেশের হিতকর বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়া আমাদিগকে যথোচিত উৎসাহিত করিলে বাধিত হইব।

শ্রীগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
শ্রীনবগোপাল মিত্র
সহকারী সম্পাদক।"

যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে কার্য্য-সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম আজ বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক মনে হয়ঃ—

১। শ্রীযুক্ত রাজা কমল কৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীশ্বর মিত্র, দুর্গাচরণ লাহা, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, জয়গোপাল সেন, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, কৃষ্ণদাস পাল, এবং যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর।

২। শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ভোলানাথ পাল, রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এবং জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত।

৪। শ্রীযুক্ত কুমার সুরেন্দ্র কৃষ্ণ দেব, বাবু জয়গোপাল সেন, প্রসাদদাস মল্লিক, প্রিয়নাথ ঘোষ, ব্রজনাথ দেব, জয়গোপাল মিত্র, যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এবং সালিকরাম।

৫। শ্রীযুক্ত কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, অক্ষয়কুমার মজুমদার এবং ব্রজনাথ দেব।

৬। শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, দুর্গাদাস কর, গোপাললাল মিত্র এবং অম্বিকাচরণ গুহ।

" শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ভবানী চরণ গুহ, নীলকমল মুখোপাধ্যায় এবং যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। ইহারা আয়ব্যয় পরীক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।"

প্রস্তাবগুলি অধিকাংশ স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তির নিকট সমাদৃত হইয়াছিল এবং অনেকেই এই অনুষ্ঠানে অর্থ-সাহায্য প্রদান করেন। সাহায্য কারী-দিগের নামের তালিকা, প্রত্যেকের সাহায্যের পরিমাণ ও ব্যয়ের হিসাব কার্য্য-বিবরণে প্রদত্ত হইয়াছিল।

কার্য্যবিবরণে "রাজ্য সম্বন্ধীয়," "বাণিজ্য," "স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয়," "মৃত্যু," "বিদ্যাসম্বন্ধীয়" ও "সমাজ সম্বন্ধীয়" সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছিল। স্থানাভাব হেতু আমরা সকল বিভাগের সংবাদের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতে পারিলাম না। "বিদ্যা সম্বন্ধীয় "একটি মাত্র সংবাদের উল্লেখ করা যাইতেছে— "যশোহর স্থানের নিকটবর্ত্তী অমৃত বাজারাস্থ অমৃত যন্ত্রালয় হইতে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে।" এইঅমৃতবাজার পত্রিকা' আজ ভারতে সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছে


মতিলাল ঘোষ

মেলার অঙ্গ প্রদর্শনীতে ফল ও শাক হইতে আরম্ভ করিয়া স্ত্রীলোকদিগের কৃত কতকগুলি শিল্পকার্য্য পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হয়। সভায় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর একটি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ও শিবনাথ শর্ম্মার (শাস্ত্রী) একটি কবিতা পঠিত হয়। কবিতাগুলিতে লেখকদিগের বয়সের তারুণ্যপরিচয় প্রকট; কিন্তু সবগুলিতেই বাঙ্গালার প্রতি শ্রদ্ধাভাব সপ্রকাশ।

"মেলায় এ দেশীয় মল্লদিগের কৌশল প্রদর্শিত হয়। এই মল্লেরা যে সকল কৌশল প্রদর্শন করে, তাহা ভারতবর্ষীয়দিগেরই সৃষ্ট; এই নিমিত্ত আমরা অন্য কাহারও নিকট ঋণী নহি।"

এই স্থানে একটি কথার আলোচনা অসঙ্গত হইবে না। "চৈত্র মেলার" উদ্দেশ্য-বিবৃতি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, ইহার "হিন্দু মেলা" নাম সার্থক হইয়াছিল। কেন না, ইহা হিন্দুদিগের জন্যই কল্পিত। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বাঙ্গালার তৎকালীন নেতারা মুসলমানদিগকে বাদ দিয়াছিলেন কেন? ইহার উত্তর সহজে দেওয়া যায়। মুসলমানরা তখনও এইরূপ জাতীয় ও রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে চাহিতেন না। তখনও মুসলমানরা ইংরাজী শিক্ষার অনুরাগী হয়েন নাই। দেশাত্মবোধ সেই শিক্ষায় প্রস্ফুরিত হইয়াছে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে—কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার ৩ বৎসর পরে, সার জন ষ্ট্রেচী তাঁহার ভারতবর্ষের শাসন ও উন্নতি সম্বন্ধীয় পুস্তকে লিখিয়াছিলেন—উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য অবলম্বিত উপায় হিন্দুদিগের দ্বারা যত অবলম্বিত হইয়াছে, মুসলমানদিগের দ্বারা তত হয় নাই। ভারতবর্ষের নানা স্থানে মুসলমানরা—বিশেষ উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানরা—ইংরাজের বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহের অভাব দেখাইয়াছেন এবং অনেক সময় অনুযোগ শুনা যায়, সেই জন্য সরকারের চাকরীতে তাঁহারা হিন্দুদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারেন না। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অসহিষ্ণুতা সময় সময় মুসলমানদিগকে প্রতীচ্য জ্ঞানের অনুশীলন-প্রয়োজন

স্বীকারে অসম্মত করায় (Feelings of religious intolerance sometimes tend to make the Muhammadans refuse to admit the necessity of western knowledge.) কিন্তু মুসলমান-দিগের এই ভাবের সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণও আছে। সে সকল কারণের মধ্যে সার জন আরবী ও ইসলামী ব্যবস্থা শিক্ষায় কালক্ষেপের উল্লেখ করেন।

আজ যখন বাঙ্গালার বাঙ্গালী মুসলমানরা মাতৃভাষার স্থানে উর্দ্দুর অনুশীলন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তখন সার জনের উক্তি তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভাল হয়।

বাঙ্গালার মুসলমানরা এখন ইংরাজী শিক্ষালাভে আগ্রহ প্রকাশ করি-তেছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দেও দেখা গিয়াছিল, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে নানা ধর্ম্মাবলম্বীর দানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মোট ১৬ লক্ষ টাকা পাইয়াছিল, আর পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ বৎসরে মুসলমানের দান মাত্র ৬ শত টাকা!

কিন্তু হিন্দুরা যে অধিকার চাহিয়াছেন, তাহা হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান-নির্ব্বিশেষে ভারতবাসী মাত্রেরই জন্য। তাঁহারা সাম্প্রদায়িকতাকে কখন জাতীয়তার পুণ্যমন্দিরে প্রবেশাধিকার প্রদান করেন নাই, কখন বলেন নাই—হিন্দুদিগকে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক চাকরী বা কোনরূপ অধিকার দিতে হইবে।

মুসলমানরা যাহাতে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন, সে জন্য হিন্দুদিগকে চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দেও যে "হিন্দু মেলার" অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ আমরা করিয়াছি। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই তারিখে ভারত সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার এক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই এই সভাস্থাপনের আয়োজন চলিতেছিল। সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন:—

[১] দেশে প্রবল জনমতের সৃষ্টি করা।

[২] একই রাজনীতিক স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ করা।

[৩] হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়দ্বয়ে সম্প্রীতি স্থাপন করা।

[৪] রাজনীতিক কার্য্যে জনগণকে আকৃষ্ট করা।

সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তাঁহার মত আরও অনেকে এই সব উদ্দেশ্য সাধনচেষ্টা করিতেছিলেন ; এই আদর্শ তখন দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে ("They were in the air, and the possession and property of every thoughtful and patriotic Indian")



জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারত সভা যখন স্থাপিত হয়, তাহার পূর্ব্বেই ইণ্ডিয়ান লীগ স্থাপিত হইয়াছিল। 'অমৃত বাজার পত্রিকার' শিশির কুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষ এবং 'রেইস এণ্ড

রায়ৎ' পত্রের সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট কায করিয়াছিলেন। শম্ভুচন্দ্র সে সময় ইংরাজী লেখক বাঙ্গালীদিগের মধ্যে এক জন অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি নানা বিষয়ে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ছিলেন। তিনি পঞ্জাবীদিগের মত বেশ পরিধান করিতেন; কক্ষব্যাপী মশারির মধ্যে আলো লইয়া (তখন বিদ্যুতালোক প্রচলিত হয় নাই) রাত্রিকালে রচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন এবং তীব্র সমালোচনা ভালবাসিতেন। তিনি কিছুদিন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের সম্পাদকও ছিলেন। শিশিরকুমার ও মতিলালের নামের সহিত সংযুক্ত থাকাতেই ইণ্ডিয়ান লীগের গণতান্ত্রিক প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়। ভারত সভার কথা 'আত্মচরিতে' লিখিবার সময় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ইণ্ডিয়ান লীগ স্থাপন সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতে মনে করা যাইতে পারে, লীগ স্থাপন ভারত সভা স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্যও হইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন, মনোমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তিনি যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন তখন শিশির বাবুকে তাঁহাদের পরামর্শের মধ্যে লওয়া হয়; কেন না 'অমৃতবাজারের' শিশির-


মনোমোহন ঘোষ

কুমার ঘোষ মহাশয় আনন্দমোহন বাবুর বন্ধু এবং আমারও প্রিয়বন্ধু ছিলেন।" তাহার পর সভা সংস্থাপন করা স্থির হইলে শিশির বাবুর দল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "এই সভার সম্পাদক হবেন কে?" তাহাতে আনন্দমোহন বাবু উত্তর দিলেন, সকলে যাঁহাকে মনোনীত করিবেন, তিনিই সম্পাদক হইবেন। ইহার পর—ভারত সভা স্থাপনের বিজ্ঞাপন বাহির হইলে "২।১ দিন পরে সংবাদপত্রে হঠাৎ বিজ্ঞাপন দেখা গেল যে, 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামে মধ্যবিত্তদিগের জন্য একটী রাজনৈতিক সভা স্থাপন করিবার জন্য এক সভা হইবে। * আমরা একেবারে গাছ হইতে পড়িয়া গেলাম। শিশির বাবু এই লীগের সম্পাদক হইলেন।" শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তির ইঙ্গিত—শিশির বাবু স্বয়ং সম্পাদক হইবেন বলিয়াই লীগ স্থাপন করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার কি ভাবিয়া স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। হয়ত তাঁহার বিশ্বাস ছিল, একাধিক প্রতিষ্ঠানে কার্য্য অধিক অগ্রসর হইবে। সে যাহাই হউক, লীগ যে তাঁহার পরিচালনায় রাজনীতিক কার্য্যে অনেক সাহায্য করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুরেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন:— "The Indian League did useful work." শিশিরকুমার ও মতিলাল গণতন্ত্রের অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন এবং তাঁহারা দেশে স্বায়ত্ত-শাসন-মূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় ও দেশাত্মবোধবিকাশে স্মরণীয় কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। লর্ড লিটনের দেশীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্রের দমন জন্য কল্পিত আইন বিধিবদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত 'অমৃত বাজার পত্রিকা' বাঙ্গালায় ও পরে আংশিকরূপে ইংরাজীতে পরিচালিত হইয়া ঐ আইনের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজীতে পরিচালিত হইতে আরম্ভ হয়। হরিশ্চন্দ্রের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' যেমন দুর্ব্বলের রক্ষক ছিল, পরে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' তেমনই সেই কায করিয়াছে। শেষে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' জমীদার সভার মুখপত্র হয়।

শিশির কুমার কলিকাতায় আসিয়া প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় পত্র পরিচালনে প্রবৃত্ত হয়েন এবং বিস্ময়ের বিষয় তিনি ভাগ্যকূলের প্রসিদ্ধ ধনী (পরে রাজা) জানকীনাথ রায়ের, রায় বাহাদুর সীতানাথ রায়ের (পরে রাজা) দিগম্বর মিত্রের, ও (পরে মহারাজা বাহাদুর) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বন্ধুত্ব অর্জ্জন করেন এবং প্রথমোক্তদ্বয় 'পত্রিকা'-পরিচালনে অর্থ-সাহায্যও করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

এই সময়ের বাঙ্গালা সাহিত্য পরীক্ষা করিলেই তৎকালে বাঙ্গালায় উদ্বেল জাতীয়ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রাজপুতনার ইতিহাস হইতে উপকরণ লইয়া 'পদ্মিনীর উপাখ্যান' রচনা করেন। তাঁহার উত্তেজনাময়ী উক্তি একদিন বাঙ্গলার বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের কণ্ঠস্থ ছিল :—



রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল, বল, কে পরিবে পায় রে
কে পরিবে পায় ?"

যে আইরিশ কবি আয়র্লণ্ডের দুঃখে অশ্রুপাত করিয়াছিলেন, এই উক্তি সেই কবি মুরের রচনার প্রতিধ্বনি :—

From life without freedom, say, who
would not fly ?
For one day of freedom, oh ! who
would not die ?"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' নাটকও জাতীয়ভাবের বিকাশ।

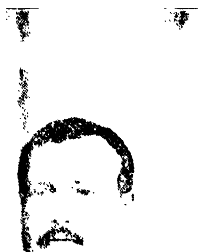
"চৈত্র মেলায়" গীত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "গাও ভারতের জয়" গানের উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' বক্তৃতা এই গানটি উদ্ধৃত করিয়া সমাপ্ত করেন। ঐ বক্তৃতা যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তখন উহার সমালোচনা করিতে যাইয়া 'বঙ্গদর্শন' লিখিয়াছিলেন :—

"রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হউক। এই মহাগীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক; হিমালয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক; গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-নর্ম্মদা-গোদাবরীতটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক; পূর্ব্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জ্জনে মন্দ্রীভূত হউক। এই বিংশতিকোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।

এই 'বঙ্গদর্শন'-প্রচার বাঙ্গালা সাহিত্যে যেমন, বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে তেমনই, বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, ইহার দ্বারা তিনি সাহিত্যের সকল বিভাগের পথ মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সাহিত্যের সকল বিভাগের মধ্যে রাজনীতিক বিভাগ অবজ্ঞাত হয় নাই। যে কার্য্য পূর্ব্বে 'সোমপ্রকাশ' 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রভৃতি সাপ্তাহিক পত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইতেছিল 'বঙ্গদর্শনের' রচনায় তাহা আরও গভীর ও গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হইতে থাকে।

যিনি 'বঙ্গদর্শনের' পদাঙ্কানুসরণ করিয়া 'আর্য্যদর্শন' প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, সেই যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বাঙ্গালীকে ম্যাটসিনী, গারিবল্ডী প্রভৃতি দেশপ্রেমিকের চরিতকথা—তাঁহাদিগের মুক্তিসংগ্রামে আগ্রহের কথা শুনাইয়া ধন্য করিতে থাকেন। তাঁহার 'আত্মোৎসর্গ' কেন যে প্রত্যেক বালকবালিকাকে পাঠ করান হয় না, বলিতে পারি না।

যে রজনীকান্ত গুপ্ত সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহার 'আর্য্যকীর্ত্তি'ও বাঙ্গালায় দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ করিতে সহায় হইয়াছিল।





রজনীকান্ত গুপ্ত

যে রমেশচন্দ্র দত্ত জীবনের সায়াহ্নে বিদেশে বহু শ্রমে ইংরাজী শাসনে ভারতের আর্থিক অবস্থার ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন, তিনিই যৌবনে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহে বঙ্গ ভারতীয় সেবায় প্রবৃত্ত হয়েন, তখন—শত বর্ষের ভারতের ইতিহাস-সিন্ধু মন্থন করিয়া যাহা উদ্ধার করিয়া দেশবাসীকে দিয়াছিলেন, তাহা 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যায়' ও 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতে' দেখা যায়। তিনি তাঁহার 'মাধবী-কঙ্কণ' উপন্যাসখানি তাঁহার সতীর্থ ও সুহৃদ

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করিবার সময় লিখিয়াছিলেন, সুরেন্দ্র নাথ যে দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তদপেক্ষা পুণ্য ব্রত আর নাই। তিনি ভারতের অর্থনীতিক দুর্দ্দশার যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ইংরাজের প্রামাণ্য বিবরণের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা একটি দৃষ্টান্ত



রমেশচন্দ্র দত্ত

দিতেছি। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী তারিখে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে নির্দ্দেশ করেন, তদনুসারে ডাক্তার ফ্রান্সিস বুকাননকে বিহার, পাটনা,

সাহাবাদ, ভাগলপুর, দিনাজপুর, গোরক্ষপুর, পূর্ণিয়া, রংপুর ও আসাম জিলাগুলির শিল্প, কৃষি, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে তদন্ত করিয়া বিবরণ দাখিল করিবার কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। প্রায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে এই কার্য্য আংশিকরূপে সম্পন্ন হইবার পর বন্ধ করা হয় এবং বুকাননের লিখিত বিবরণ বিলাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউসে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ঐ পাণ্ডুলিপি হইতে মণ্টগমারী মার্টিণ যখন ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করেন, তখন তাহার ভূমিকায় তিনি লিখেন, ভারতবর্ষ হইতে বৎসরে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বিলাতে যাইতেছে ; বার্ষিক ১২ টাকা সুদ হিসাব করিলে উহা ৩০ বৎসরে ১০৮৫ কোটি টাকার উপর হয়—এইরূপে টাকা দেশের বাহিরে যাইলে বিলাতের মত ধনী দেশও দরিদ্র হয়, ভারতবর্ষের ত কথাই নাই—

"This annual drain of £ 3,000,000 on British India, has amounted in 30 years, at 12 per cent. [the usual Indian rate] compound interest, to the enormous sum of £ 723,997,971, sterling ; or at so low a rate as £ 2,000,000 for 50 years, to £ 8, 400,000,000. So constant and accumulating a drain even on England would soon impoverish her ; how severe then must be its effects on India, where the wages of a labourer is from two pence to three pence a day ?"

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ার বলিয়াছিলেন, তিনি যখন এ দেশে আইসেন, তখনও এ দেশে নানা পণ্য উৎপন্ন হইত, দেশের সম্পদ অক্ষয় ছিল—ইত্যাদি। কিরূপে ভারতের শিল্প নষ্ট হইয়াছিল, তাহা এ দেশের কার্পাস পণ্য বিলাতে আমদানী বন্ধ করায় যেমন, এ দেশে প্রস্তুত জাহাজ

বিলাতে প্রবেশ বন্ধ করায়ও তেমনই, বুঝা যায়। জাহাজের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার কারণ নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে বিলাতের কোম্পানীর কর্ত্তারা বলিয়াছিলেন, এ দেশের নাবিকরা যদি সে দেশে যাইয়া ইংরাজের সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থা দেখিয়া আইসে, তবে তাহারা আর ইংরাজকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিবে না। ভারতের আর্থিক দুর্দ্দশার এই সব কারণ রমেশচন্দ্র প্রমাণ সহ তাঁহার পুস্তকে বিবৃত করিয়াছিলেন।



দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর

বঙ্কিম-মণ্ডলের যাঁহারা সাহিত্যিক তাঁহারা সকলেই জাতীয় ভাবের ভাবুক ছিলেন। তাঁহারা ভিন্ন দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত কথাই নাই। নবীন চন্দ্র সেনের কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি।

এই স্থানে আর এক জন বাঙ্গালী কবির উল্লেখ করিব। তিনি যৌবনে প্রচলিত ধর্ম্মমতে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করায় পিতার বিরাগভাজন হইয়া দূর আগ্রায় যাইয়া জীবিকার্জ্জন করিয়াছিলেন। তথায় যমুনার কূলে তিনি যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, সে সকলের মধ্যে মাত্র দুইটি সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজ কবি গ্রে যেমন ২।৩টি কবিতার জন্য ইংরাজ

কবিসমাজে অটল আসন লাভ করিয়াছেন, গোবিন্দ চন্দ্র রায় তেমনই এই



গোবিন্দ চন্দ্র রায়

দুইটি কবিতার জন্য অমর হইয়াছেন। তাহার একটি "যমুনা-লহরী".

"নির্ম্মল-সলিলে বহিছ সদা
তটশালিনী সুন্দর যমুনে। ও

কল্‌-কল ভাষে বহিয়ে কাহিনী
কহিছ সবে কি পুরাতন। ও
স্মরণে আসি' মরম পরশে কথা
ভূত সে ভারত-গাথা। ও

তব জল-কল্লোল সহ কত সেনা
গরজিল কোন দিন সমরে। ও
আজি শব-নীরব রে যমুনে সব,
গত যত বৈভব কালে। ও

শ্যাম সলিল তব লোহিত ছিল কভু
পাণ্ডব-কুরুকুল শোণিতে। ও
কাঁপিল দেশ তুরগ-গজভারে
ভারত স্বাধীন যে দিন। ও ”
—ইত্যাদি

দ্বিতীয় কবিতা “কত কাল পরে”—

“কত কাল পরে বল ভারত রে,
দুঃখ-সাগর সাঁতারি’ পার হ’বে ?
অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে
ও কি শেষ নিবেশ রসাতল রে ?
নিজ বাস-ভূমে পরবাসী হ’লে,
পর দাস-খতে সমুদায় দিলে ;
নিজ অন্ন পরে কর-পণ্যে দিলে
পরিবর্ত্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে,
তুমি অন্ধ হয়ে পর স্বর্গসুখে
তুমি আজও দুঃখে তুমি কালও দুঃখে।
নিজ ভাল বুঝে পর মন্দ নিলে
ছিল আপন যা’ ভাল তাঁও দিলে।
পর-হাতে দিয়ে ধন রত্ন সুখে
বহ লৌহবিনির্ম্মিত হার বুকে।

পর ভাষণ, আসন, শাসন রে ;
পর-পণ্যে ভরা তনু আপন রে।
পর-দীপ-শিখা নগরে নগরে ;
তুমি যে তিমিরে—তুমি সে তিমিরে।

* * *

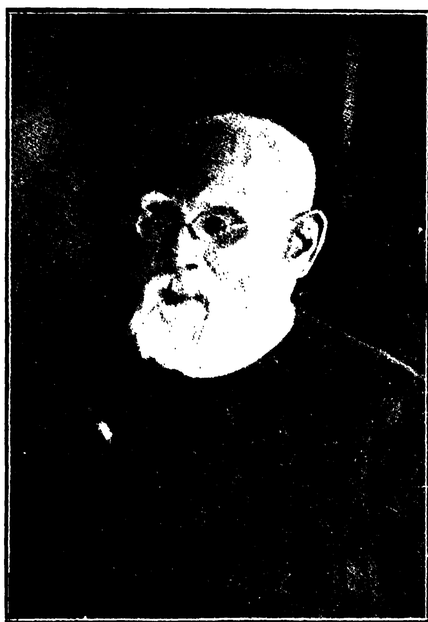
অহ! কে বহিবে সে সুদীর্ঘ কথা,
সম সিন্ধু অপার অগাধ ব্যথা।
বিধি বাদী হ'লে পরমাদ ঘটে,
পরমাদ হরে হিতেবোধ ঘটে।
কি ছিলে, কি হ'লে, কি হ'তে চলিলে
অবিবেক বশে কিছু না বুঝিলে।
যদি কেহ দেয় স্বরগের সুখে,
তবু শ্লাঘ্য নহে স্ববশের দুঃখে।
বন-বর্ব্বরও স্ববসত্ব খুঁজে,
তবু ভারত সে সব নাহি বুঝে।"

—ইত্যাদি।

গোবিন্দচন্দ্রের অনুজ আনন্দচন্দ্র রায় বর্ত্তমান লেখককে লিখিয়াছিলেন, তাঁহার অগ্রজ বহু কবিতা লিখিয়াছিলেন, সে সবই ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দুরবস্থায় বিলাপ।

বাঙ্গালী সাহিত্যিক বাঙ্গালার বাহিরে যাইয়াও বাঙ্গালায় স্বদেশ প্রেমাত্মক রচনায় সাহিত্য পুষ্ট করিয়াছেন ; আর বাঙ্গালী কার্য্যোপলক্ষে যিনি যে স্থানে বাস করিয়াছেন, সেই স্থানেই নবজাগরণের আয়োজন করিয়াছেন। বাঙ্গালায় সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং রাজকার্য্যের প্রায়োজনে যেমন বহু বাঙ্গালী অন্যান্ত প্রদেশে গিয়াছিলেন, তেমনই

অর্থার্জ্জনের জন্য ও শিক্ষাবিস্তার বা ধর্ম্মপ্রচারের জন্যও অনেক বাঙ্গালী বাঙ্গালার সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন। তখন বহু প্রদেশে বাঙ্গালীরা নেতৃত্ব করিতেছেন এবং সে সব প্রদেশে লোকমত গঠিত করিতেছেন। নূতন বিহার বাঙ্গালীর সৃষ্টি—উড়িষ্যা সম্বন্ধেও তাহাই বলা যায়। যুক্ত-প্রদেশে, পঞ্জাবে, সুদূর করাচীতে বাঙ্গালীরাই বহুদিন ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। কংগ্রেস স্থাপনের অত্যল্পকালপূর্ব্বে প্রকাশিত 'নব ভারত' পুস্তকে সার হেনরী জন কটন লিখিয়াছিলেন ; ভারতের নানা প্রদেশের



সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষিত ব্যক্তিরা এখন একমতাবলম্বী হইয়াছেন এবং—"The educated lasses are the voice and brain of the country. The

Bengalee Baboos now rule public opinion from Peshawar to Chittagong" অর্থাৎ শিক্ষিত সম্প্রদায়ই দেশের মস্তিষ্ক—পেশাওয়ার হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের লোকমত বাঙ্গালীদিগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। . . বাঙ্গালায় তখন এত জাতীয় সঙ্গীত রচিত হইয়াছে যে, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সেগুলি একখানি পুস্তকে সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিয়াছেন।



দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বারকানাথ বাবু যে ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হইয়াছিলেন সেই ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত ব্যক্তিরা তখন ধর্ম্মমত প্রচারে ও সমাজ-সংস্কারের কার্য্যে যেমন, দেশবাৎসল্য প্রচারেও তেমনই বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্য্য করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে

এই স্থানে কেশবচন্দ্র সেনের নাম উল্লেখ করিতে হয়। বিদেশে ভারতের ধর্ম্মমত প্রচারে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব্বগ্রামী এবং বিলাতে যেমন তিনি ভারতের অবস্থা ব্যক্ত করিয়াছিলেন মার্কিণে তেমনই তাঁহার সোদরপ্রতিম প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কার্য্যের বিশেষ উল্লেখ করিতে হয়। কেশবচন্দ্র এ দেশে প্রথম সুলভ সংবাদ পত্র প্রচার করেন; 'সুলভ সমাচার' সে বিষয়ে অগ্রণী। আবার ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের অর্থানুকূল্যে মনোমোহন ঘোষ ইংরাজীতে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্র প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি পরে এ দেশের শাসন ও বিচার বিভাগদ্বয়ের পার্থক্য সাধনের জন্য তুমুল আন্দোলন করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসের শক্তিশালী কর্ম্মী ছিলেন। ইহার পর ব্রাহ্ম সমাজের আনন্দমোহন বসু, বিপিন চন্দ্র পাল, কৃষ্ণ কুমার মিত্র প্রমুখ কর্ম্মীরা জাতীয় আন্দোলনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ভারত সভা সংস্থাপনের উদ্যোগীদিগের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী অন্যতম।



প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

বাঙ্গালী খৃষ্টান সমাজের লোকসংখ্যা অল্প হইলেও কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় ও কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় জাতীয় আন্দোলনে বিশেষ শক্তি-সঞ্চার করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার বাহিরে কোন কোন বাঙ্গালী খৃষ্টান জাতীয় আন্দোলনে বিশেষ কায করিয়াছিলেন।



কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আন্দোলন পরিচালনে সংবাদপত্রের উপযোগিতা বক্তার বক্তৃতা অপেক্ষাও ফলোপধায়ী। বাঙ্গালায় সংবাদপত্রের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছিল, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে কেহ নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া রাজনীতিক প্রচারকার্য্য করেন নাই। তবে দেশীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির সাহায্যে দেশে জাতীয় ভাব সকল স্তরে বিস্তার লাভ করিতেছিল। জাতীয় আন্দোলন বাঙ্গালায় পুষ্টিলাভ করিয়া বাঙ্গালীর চেষ্টায় ক্রমে বাঙ্গালার বাহিরে বিস্তার লাভ করে। বাঙ্গালাই তখন সকল প্রদেশের আদর্শ।

তৃতীয় অধ্যায়

কংগ্রেসের পূর্ব্বে

১৮৭২ এই সময় বাঙ্গালায় রাজনীতিক ভাবধারা কোন্ পথে প্রবাহিত হইতেছিল তাহা কৃষ্ণদাস পালের লিখিত ও তাঁহার সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে প্রকাশিত Home Rule for India নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। কৃষ্ণদাস তখন জমীদার সভার প্রধান কর্ম্মী। তিনি আলোচ্য প্রবন্ধে আয়র্লণ্ডের প্রসঙ্গে ভারতে শাসন-পদ্ধতির কথা আলোচনা করিয়া বলেন, বিলাতের পার্লামেণ্টে ভারতের প্রতিনিধি-স্থিতি কোন মতেই এ দেশের লোকের অভিপ্রেত হইতে পারে না। তিনি বলেন, যখন



জানকীনাথ ঘোষাল

এ দেশে ব্যবস্থাপক সভায় কোন ভারতীয়ের স্থান ছিল না, তখন অবস্থা মন্দের ভাল ছিল—কারণ, সভার [বিদেশী] সদস্যরা ভারতবাসীর অধিকার, স্বার্থ, মনোভাব ও আচার সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতেন ; কিন্তু সভায় স্বল্পসংখ্যক মনোনীত ভারতীয়কে গ্রহণ করায় তাঁহারা নিরঙ্কুশ হইয়াছেন ; তাঁহারা এখন বলেন—তাঁহারা ভারতবাসীর প্রতিনিধিদিগের সাহায্য গ্রহণ করিয়া আইন প্রণয়ন করেন। ভারতবর্ষও কখন পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে প্রস্তুত হইবে না। সুতরাং ভারতবাসীকে Home Rule বা স্বায়ত্ত-শাসন লাভে মনোযোগী হইতে হইবে—"Our attention should therefore be directed to Home Rule for India" প্রায় সকল বৃটিশ উপনিবেশেই নিয়মানুগ শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—কানাডার পার্লামেণ্ট আছে, নিউজিলণ্ড, নিউ সাউথ ওয়েলস প্রভৃতি অনুন্নত ও ক্ষুদ্র উপনিবেশগুলির ব্যবস্থাপক সভা প্রজার নির্ব্বাচিত সদস্যে গঠিত। অথচ ভারতে সে ব্যবস্থা নাই। যদি কর সংস্থাপন ও প্রতিনিধি নির্ব্বাচন অঙ্গাঙ্গী হয়, তবে ভারতবর্ষকে কিরূপে এই অধিকারে বঞ্চিত রাখা সঙ্গত ? এ দেশে ভারতীয় সভ্যরা সরকারের ব্যয়নীতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন না—সরকারী সদস্যরাই যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। "Home Rule for India ought to be our cry, and it ought to be based upon the same constitutional basis that is recognised in the Colonies."

মনে রাখিতে হইবে, এই প্রবন্ধ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। মনে রাখিতে হইবে—ইহার ৩২ বৎসর পরে প্রথম কংগ্রেসের সভাপতির আসন হইতে উক্ত হইয়াছিল—ভারতবর্ষের কাম্য—স্বরাজ বা স্বায়ত্ত-শাসন "like that of the United Kingdom or the Colonies." আরও স্মরণ রাখা প্রয়োজন—এই উক্তি যে সভাপতি দাদাভাই নৌরজীর মুখে উক্ত হইয়াছিল, সে-ও কলিকাতায় এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা এই

যে, (১) তখন বাঙ্গালায় অরবিন্দ ঘোষ "নব ভাবের" (New Spirit) ব্যাখ্যা করিতেছেন ও বাঙ্গালী প্রকাশ করিয়াছে, দেশ সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন (absolute autonomy) চাহে এবং [২] বাঙ্গালার নবীন ভাবের ভাবুকরা সে বার বাল গঙ্গাধর তিলককে কংগ্রেসে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিবার চেষ্টা করায় মধ্যপন্থীরা শঙ্কিত হইয়া দাদাভাই নৌরজীকে সভাপতির আসন গ্রহণ জন্য বিলাতে তার করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন—দাদাভাই যখন আহ্বান গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে নির্ব্বাচিত না করিলে তাঁহাকে অপমান করা হইবে।



বালগঙ্গাধর তিলক

এই সময় বাঙ্গালার ও ভারতের রাজনীতিক নদীতে বন্যার বারি প্রবেশ করিল। সিভিল সার্ভিস হইতে কর্ম্মচ্যুত হইয়া সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতীকারপ্রার্থী হইয়া বিলাতে গিয়াছিলেন; ব্যর্থমনোরথ হইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং আসিয়া জীবিকার্জ্জনের জন্য শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি তখন ম্যাটসিনীর মতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

ছাত্ররাই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার দ্বারা আকৃষ্ট হইল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় প্রথম এক সভায় বক্তৃতা করিলেন এবং তাহার পর কলিকাতা, খিদিরপুর, উত্তরপাড়া প্রভৃতি স্থানে নানা বিষয়ে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। যাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে



স্বামী বিবেকানন্দ

ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তখন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আনন্দমোহন বসু ছাত্র সভা গঠিত

করিয়াছেন। সুরেন্দ্র নাথ সেই সভার কাযে তাঁহার সহকর্ম্মী হইলেন। ছাত্রদিগের মধ্যে নবোৎসাহের সঞ্চার হইল। যাঁহারা তৎকালে ছাত্র-সভার শিষ্য ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে পরে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া ছিলেন। এই সময় সুরেন্দ্রনাথপ্রমুখ তরুণ কর্ম্মীদিগের মনে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মত সঙ্ঘবদ্ধ ও প্রকাশিত করিবার জন্য একটি সভার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল। জর্জ্জ টমশনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন তখন প্রধানতঃ জমীদার-দিগের সভা। সে সভার অপেক্ষা অধিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর, হাইকোর্টের জজ দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতিও স্বীকার করিয়া-ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি যখন নূতন সভা স্থাপনের উদ্যোগ করেন, তখন তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাহার সভাপতি করিতে চাহিয়াছিলেন—তিনি সম্মত হয়েন নাই। এই আয়োজনের ফলে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জুলাই তারিখে ভারত সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভা সংস্থাপন-প্রসঙ্গে দুইটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিতে হয়—ইহার স্থাপন-প্রস্তাব যে সভায় আলোচিত হয়, তাহাতে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান



জর্জ্জ টমশন

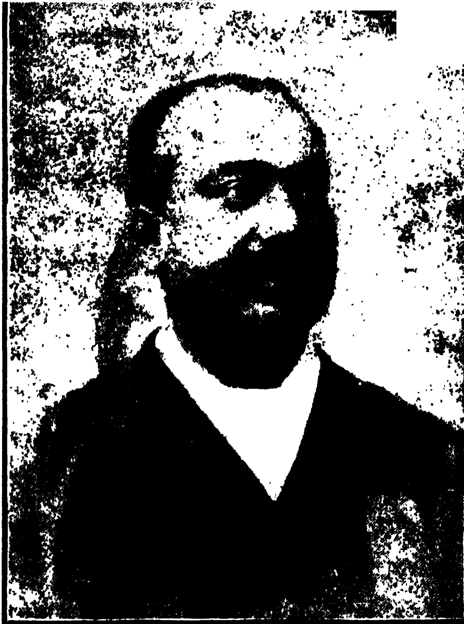
এসোসিয়েশনের মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ও কৃষ্ণদাস পাল উপস্থিত ছিলেন, আর এই সভাকে সমগ্র ভারতের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সভা করিবার কল্পনা হয়। সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, সমগ্র ভারতকে ঐক্য-বন্ধনে বদ্ধ করিবার কল্পনা তখন বাঙ্গালায় আদর লাভ করিয়াছে—"Even then, the conception of a united India......had taken firm possession of the minds of the Indian leaders in Bengal."

সভা স্থাপনের এক বৎসরের মধ্যেই সমগ্র ভারতকে এক আন্দোলনে একমত করিবার সুযোগ ঘটে। তখন লর্ড সলস্‌বেরী ভারত-সচিব। তিনি ব্যবস্থা করেন, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীর বয়স আর ২১ বৎসর হইবে না—১৯ বৎসর করা হইবে। ইহাতে ভারতীয়দিগের পক্ষে বিলাতে যাইয়া এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পথ সঙ্কীর্ণ হয়। ইহার প্রতিবাদে কলিকাতায় ভারত সভা এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান করেন এবং এই আন্দোলন উপলক্ষে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণের ভার সুরেন্দ্রনাথের উপর অর্পিত হয়। তিনি এলাহাবাদ, আগ্রা, লাহোর, অমৃতসর, মিরাট, কাশী প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া প্রতিবাদপত্রে স্বাক্ষর গ্রহণ করেন। ইহার পর সুরেন্দ্রনাথকেই বোম্বাইয়ে ও মাদ্রাজে প্রেরণ করা হয়। সুরেন্দ্রনাথের এই পরিভ্রমণ জাতীয়তার জয়যাত্রা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাই সার হেন্‌রী কটন তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছিলেন:—"At the present moment the name of Surendra Nath Banerjea excites as much enthusiasm among the rising generation of Multan as in Dacca."

কৃষ্ণদাস পাল যে ভারতে স্বায়ত্ত-শাসনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন প্রমুখ কর্ম্মীদিগের নিকট কৃষ্ণদাসও যথেষ্ট অগ্রগামী নহেন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ যখন রাজনীতিক কার্য্যে পঞ্জাবে গমন করেন, সেই সময় তাঁহার সহিত সর্দ্দার দয়াল সিংহ মাজিথিয়ার পরিচয় হয়। তিনি পঞ্জাবে নবভাব প্রচারজন্য সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিলে সুরেন্দ্রনাথের মনোনীত বাঙ্গালী যুবক শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় লাহোরে যাইয়া তাহার সম্পাদানভার গ্রহণ করেন।

সিভিল সার্ভিসের নিয়মের বিরুদ্ধে যে আবেদন স্বাক্ষরিত হয়, তাহা বিলাতে পেশ করিবার জন্য কাহাকেও তথায় পাঠাইবার কল্পনা হয়। কিন্তু অর্থের অভাবে সে কল্পন কার্য্যে পরিণত করা দুষ্কর হইলে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হয়। সে অর্থ সংগ্রহের কার্য্যও বাঙ্গালায় সম্পন্ন হয় এবং সাহায্যের জন্য সুরেন্দ্রনাথ যখন মহারাণী স্বর্ণময়ীর দ্বারস্থ হইবার কথা



লালমোহন ঘোষ

বলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই তাঁহাকে দাওয়ান রাজীবলোচন রায়ের নিকট পরিচয়পত্র প্রদান করেন। আবশ্যক অর্থের যে অংশ তখনও সংগৃহীত

হয় নাই, তাহা রাজীবলোচন মহারাণীর পক্ষ হইতে প্রদান করেন এবং লাল-মোহন ঘোষের উপর বিলাত যাইবার ভার অর্পিত হয়। তিনি বিলাতে যাইয়া যে সভায় বক্তব্য ব্যক্ত করেন, জন ব্রাইট তাহাতে সভাপতি ছিলেন। এই অসাধারণ বাগ্মীর সেই বক্তৃতার পর দিনই এ দেশে সিভিল সার্ভিসে লোক নিয়োগের নিয়ম হয়। এই চাকরী Statutory Civil Service নামে পরিচিত ছিল। স্বদেশে ফিরিবার পর লালমোহনকে পুনরায় রাজনীতিক কার্য্যে বিলাতে প্রেরণ করা হয় এবং এই বার তথায় অবস্থানকালে তিনি পার্লামেণ্টে সদস্য নির্ব্বাচিত হইবার চেষ্টা করেন। আইরিশদিগের ভোট না পাওয়ায় তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

এই সময় লর্ড লিটন বড় লাট হইয়া আসিলেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ প্রদানপ্রসঙ্গেও বিলাতের প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ষ্টেড লিখিয়াছিলেন—তাঁহার মত threatrical personalityকে কিরূপে যে ইংরাজ ভারতের বড় লাট করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। মাদ্রাজে যখন দুর্ভিক্ষে লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল, তখন তিনি দিল্লীতে দরবারে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সিমলা শৈলে যাইয়া শৈত্য ও বিলাস সম্ভোগ করিতেছিলেন! লোকক্ষয়ে ব্যথিত ও বিচলিত হইয়া মাদ্রাজের গভর্ণর ডিউক অব বাকিংহাম নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া নিজ দায়িত্বে বিলাতে অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। লর্ড লিটনের সরকার ব্যবস্থাপক সভার একটিমাত্র অধিবেশনে দেশীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্র সম্বন্ধে যে আইন লিপিবদ্ধ করেন, তাহাতে সেই সব সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নষ্ট করা হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তখন হরিশ্চন্দ্রের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' জমীদার সভার মুখপত্রে পরিণত হইয়া অত্যন্ত সংযতভাবে এই আইনের প্রতিবাদ করিলেও বাঙ্গালায় পরিচালিত পত্রগুলি সমালোচনায় যথেষ্ট সাহস দেখাইয়া ছিলেন। এই সব সংবাদপত্রের মধ্যে তখন 'সোমপ্রকাশ' গাম্ভীর্য্যে শ্রেষ্ঠ এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত

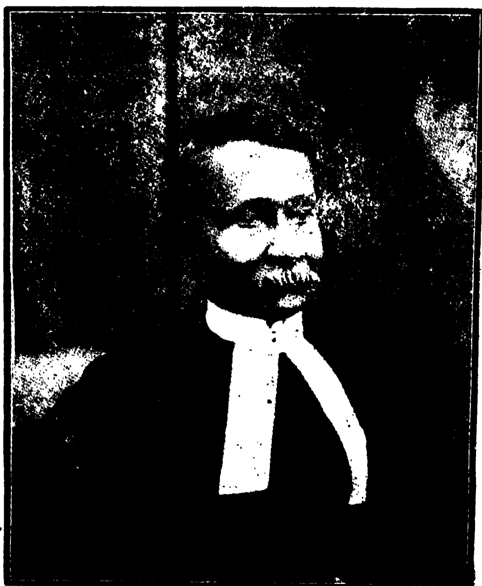
'সাধারণী' তীব্র, 'অমৃতবাজার পত্রিকা' তীব্রতর ; 'অমৃত বাজার পত্রিকার' পরিচালক শিশিরকুমার ঘোষ ভ্রাতা মতিলালের নিকট আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে শুনিয়াই পরসংখ্যা পত্র ইংরাজীতে প্রকাশ করেন।

ভারতসভা যখন অগ্রণী হইয়া এই আইনের প্রতিবাদ-সভানুষ্ঠানের আয়োজন করেন, তখন কেহ কেহ সে সভায় যোগ দিতে শঙ্কানুভব করেন ; সেরিফ সভা আহ্বান করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। আবার যে দিন টাউন হলে সভা হইবে (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল) সেই দিন রুসিয়ার সহিত যুদ্ধসম্ভাবনা কল্পনা করিয়া ভারতবর্ষ হইতে মন্টায় ৬ হাজার ভারতীয় সৈনিক প্রেরিত হওয়ায় কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু ধনীরা যখন শঙ্কিত, তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকরা দেশের লোকের অধিকার-সঙ্কোচের প্রতিবাদ করিবেন—স্থির করিয়া সভাধিবেশন করা হয়। বৃদ্ধ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃগণের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মযাজক কে, এস, ম্যাকডোনাল্ড, রাসবিহারী ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিষ্টার ফিস্ক, ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্র ছিলেন। এই প্রতিবাদ পার্লামেণ্টের গোচর করিবার জন্য আবেদন রচনা প্রভৃতি কার্য্যের ভার যে সমিতির উপর অর্পিত হয়, তাহার সদস্যদিগের নাম :—

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
টি, পালিত (পরে সার তারকনাথ পালিত)
চন্দ্রমাধব ঘোষ (পরে সার চন্দ্রমাধব ঘোষ)
কে, এস, ম্যাকডোনাল্ড
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
যোগেশচন্দ্র দত্ত

রাসবিহারী ঘোষ (পরে সার রাসবিহারী ঘোষ)
ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রবোধ চন্দ্র মল্লিক
নিত্যলাল মল্লিক
জগন্নাথ খান্না
ডাক্তার (পরে সার) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
নবগোপাল মিত্র
কাশীনাথ মিত্র
গণেশচন্দ্র চন্দ্র
আনন্দমোহন বসু (সম্পাদক)

ইহার পর লর্ড লিটনের সরকার অস্ত্র আইন বিধিবদ্ধ করিয়া ভারতবাসীকে অস্ত্র ব্যবহারের অধিকারে বঞ্চিত করেন। ইহাতেও ভারতব্যাপী অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।


গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

কিন্তু বাঙ্গালায় সংবাদপত্র বিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনই অধিক প্রবল হইয়াছিল। সেই আন্দোলনের ফলে বিলাতে পার্লামেণ্টে গ্ল্যাডষ্টোন এই আইনের

নিন্দা করিয়া যে বক্তৃতা করেন, তাহা স্মরণীয়। কৌতূহলী পাঠক সে বক্তৃতা বর্ত্তমান লেখকের Press and Press Laws in India নামক পুস্তকে উদ্ধৃত দেখিতে পাইবেন। বিলাতে মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন-ফলে লর্ড লিটন ভারতবর্ষ ত্যাগ করে—এবং প্রধান মন্ত্রী হইয়া গ্ল্যাডষ্টোন লর্ড রিপণকে বড় লাট নিযুক্ত করেন। তিনি লর্ড রিপণকে সংবাদপত্র বিষয়ক আইন প্রত্যাহার করিতে উপদেশ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং লর্ড রিপণের আদেশে যখন ঐ আইন প্রত্যাহৃত হয়, তখন এ দেশের লোকের আন্দোলনের কৃতকার্য্যতায় বিশ্বাস দৃঢ় হয়।

ইহার পূর্ব্বেই সুরেন্দ্রনাথ 'বেঙ্গলী' পত্র ১০৲ টাকায় কিনিয়া তাহার সম্পাদকের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। 'বেঙ্গলীও' তখন নূতন ভাবের প্রচারক হইয়াছে।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে লর্ড রিপণের সরকার ফৌজদারী বিচার আইনের সংশোধক এক আইনের পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করেন। ইহাই ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত। এই আইনে মফঃস্বলে ইংরাজ আসামীদিগকে উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় বিচারকদিগের বিচারাধীন করিবার প্রস্তাব করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ ও রমেশচন্দ্র দত্তের সতীর্থ সিভিল সার্ভিসে চাকরীয়া বিহারীলাল গুপ্ত পূর্ব্বে এই বিষয়ে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা সরকারকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ছোট লাট সার এসলি ইডেন উহা ভারত সরকারে প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং মত প্রকাশ করেন যে, বিলাত হইতে নিযুক্ত ভারতীয় সিভিলিয়ানদিগের জজ হিসাবে যুরোপীয় আসামীদিগের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতা থাকাই সঙ্গত। ভারত সরকার এ বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারসমূহের মত জানিতে চাহেন এবং সেই সব মত প্রদত্ত হইলে আলোচ্য আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়।

যে অসঙ্গত নীতি ও ববস্থা দূর করিবার উদ্দেশ্যে এই আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হয়, বাঙ্গালী বহুদিন হইতে তাহার প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে (৬ই এপ্রিল) রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের যে পত্র এক সভায় পঠিত হয়, তাহাতে তিনি এই মত ব্যক্ত করেন।

এই ব্যবস্থায় যে বিচারের মর্য্যাদাও ক্ষুন্ন হয়, তাহা ইংরাজরাও স্বীকার করিয়াছেন :—

(১) ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে গোরা সৈনিক হকিন্স বন্দুকের কুঁদার আঘাতে হুসেন বক্স নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। নিহত ব্যক্তির "অপরাধ" সৈনিকরা ইক্ষুদণ্ড কাড়িয়া লইলে সে আপত্তি করে। দায়রা আদালতে জুরীরা আসামীকে নিরপরাধ বলিলে সে মুক্তি পায়। সেই সম্পর্কে 'পাইওনিয়র' পত্রে লিখা হয়—"It is disgusting to find a jury, consisting almost entirely of Europeans, giving colour by such a discreditable mis-performance of their duty, to the widespread feeling, in this country that in cases where Europeans and Natives are concerned, our Courts do not deal out even handed justice."

(২) সার হেন্‌রী কটন বিলাতে বলেন "When Englishmen were put upen their trial for these crmies, what was the general result? In the great majority of cases it could only be descired as a judiceal seandal."

(৩) বড় লাট হইয়া এ দেশে আসিয়া লর্ড রেডিং বলেন—Neither can it be that the reseults of the trials of Europeans concerned in criminal cases arising from acts of violence or from improper conduct have always given satisfaction to the public.

ইহাতে ভারতে ইংরাজ সমাজ ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠেন। এই সময় আর্ম্মাণী, ইহুদী ও ফিরিঙ্গীরাও ইংরাজের দলে মিলিয়া সে পক্ষের আন্দোলন পুষ্ট করায়—কোন লেখক এক ব্যঙ্গ কবিতায় ইহাদিগের কথায় লিখিয়াছিলেন :—

"—A motly creew

Of 'pucca' born Briton, the eight anna.

ইহারা যখন আত্মস্বার্থরক্ষার্থ অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা সংগ্রহ করে, তখন সে কথায় হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেনঃ—

'হুসিয়ার ইলবার্ট
দেখোহে রিপণ লাট
সাহেব-রক্ষিণী সভা সংগঠিত হয়েছে।
দুপোঁচ তেপোঁচ মিলে
লক্ষ টাকা দেছে তুলে
চামড়াকটা কতগুলা 'এম্বিরিয়স' জুটেছে।"

সভায় ব্যারিষ্টার ব্রানসনের ভারতবাসীর নিন্দাবাদ ও তাহার ফলে এটর্ণীদিগের দ্বারা তাঁহাকে ব্যবহারজীবরূপে বর্জ্জণের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সরকারী ইংরাজরা তখন লাট প্রাসাদে অনুষ্ঠান বর্জ্জন করেন। লর্ড রিপণের ভারত ত্যাগকালে কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত ইংরাজের লিখিত একটি কবিতায় এই সব অশিষ্টাচারের উল্লেখ ছিল। লর্ড রিপণ যেন তাঁহার শাসনকালের স্মৃতির আলোচনা করিতেছেন :—

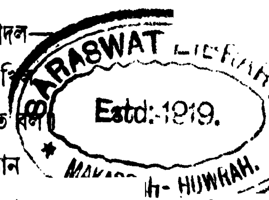
"They tell of angry gathering crowds:
Of Faction's hate-swayed throng:
Of wild words prompting wilder deeds,
Unstayed by heed of wrong ;

The cruel taunt, the scornful jest,
The slander that belies,
The coward hiss that rose unshamed
Before a woman's eyes"

য়ুরোপীয় দিগের অসঙ্গত অধিকারপ্রার্থনাও কিন্তু সরকার অবজ্ঞা করিতে পারিলেন না। শেষে প্রস্তাবিত আইনে যে পরিবর্ত্তন হইল, তাহাতে আইনের "ফাঁকিতে" য়ুরোপীয়দিগের অধিকার অক্ষুন্নই রহিল—আইনে য়ুরোপীয়ের ও ভারতবাসীর অধিকারবৈষম্য দূর হইল না। ইহাতে ভারতবাসীর নৈরাশ্য ও ক্ষোভ হেমচন্দ্র তাঁহার "মন্ত্র সাধন" কবিতায় যেরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, সেরূপে, বোধ হয়, আর কোথায়ও হয় নাই। ইহাতে ইংরাজের রাজা প্রথম চার্লসকে প্রাণদণ্ড দানের ও দ্বিতীয় জেমসকে সিংহাসনচ্যুত করার কথার উল্লেখান্তে বলা হয়ঃ—

সেই দর্প তেজ নির্ভয় অন্তরে
দেখাইলে আজ জ্বলন্ত অক্ষরে,
রাজপ্রতিনিধি পদপিষ্ট ক'রে
শিখালে ভারতে গূঢ় সন্ধান;
দিলে শিক্ষা দান ভারত-নন্দনে
দিব্যচক্ষু দিয়া—কি মন্ত্র সাধনে
পরাধীন জাতি, পরাধীন জনে
বাসনা সফল করিতে পায়।
শিখিবে ভারত শিখিবে এ কথা
চিরদিন তরে, না হবে অন্যথা—
এক দিকে কোটি-প্রাণি-কাতরতা
শ্বেতাঙ্গ ক'জন বিপক্ষ তায়।

তবুও ক'জনে চরণে দলিল
রাজপ্রতিনিধি, রাজমন্ত্রীদল—
স্বজাতি-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখি
এমনি ত'াদের অমিত বল।
শে থরে এখন ভারত-সন্তান
শ্বেতাঙ্গ নিকটে তৃণের সমান
সমগ্র ভারত জাতিকুলমান
রাজস্তুতিগান সবই বিফল।"



লর্ড রিপণ যে শ্বেতাঙ্গদিগের অসঙ্গত অধিকার স্বীকার করিলেন, সে জন্য তিনি লিখেন :—

"শুণ হে রিপণ—ভারতের লাট,
আর নাহি ক'রো এ তাণ্ডব নাট—
বিষময় ফল—বিষম বিরাট
মনুষ্য-হৃদয় সহিত খেলা।
অতি হীনবল—ঘোর কৃষ্ণকায়
সে জাতিও যদি আশার দোলায়
দুলে, বহুক্ষণে—আশা না জুড়ায়,
সে নিরাশাঘাত রোধে না বেলা।
সুধাছলে তুলে দিলে হলাহল,
সম্প্রীতি করিলে সহ নিজ দল,
বাড়া'লে তা'দের শতগুণ বল
'পৃটোরীয় গার্ড' রোমেতে যথা।"

তাহার পর তিনি "ভারত সন্তানকে" বলিয়া ছিলেন—"না হও নিরাশ।"

ভারতবাসী নিরাশ হয় নাই। ঐক্য ব্যতীত যে সাফল্য লাভ সম্ভব হয় না, তাহাও তাহারা বুঝিয়াছিল। বাঙ্গালীরা যে পূর্ব্বেই ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহার কথা আমরা বলিয়াছি।

আমরা যে সময়ের কথার আলোচনা করিতেছি, সেই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার তাঁহার 'বেঙ্গলী' পত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ আদালতের অপমানজনক বিবেচিত হওয়ায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইহাতেই বাঙ্গালায় প্রচণ্ড বিক্ষোভের উদ্ভব হয় এবং এই উপলক্ষে কৃষ্ণ-নগরের উকীল তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিলে উহাতে প্রায় ২০ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। ঐ টাকা রাজনীতিক কার্য্যের জন্য ভারত সভার হস্তে ন্যস্ত করা হয়।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বর কলিকাতায় এক পরামর্শ সভা হয়। তাহাতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতি-নিধিস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে আসিবার জন্য আহ্বান করা হয়। ইহাতে অন্যান্য প্রদেশ হইতে যে বহু প্রতিনিধি সমাগত হইয়াছিলেন, এমন বলা যায় না; কিন্তু সে চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাই সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—তখন সমগ্র ভারতের সহযোগ লাভের চেষ্টা হইতেছে এবং "The moral transformation which was to usher in the Congress movement had thus already its birth in the bosom of the Indian National Conference which met in Calcutta."

যখন এই সভাধিবেশন হয়, তখন উইলফ্রিড ব্লাণ্ট ভারত ভ্রমণে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার 'India under Ripon'

পুস্তকে ২৮শে ডিসেম্বরের দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছেন, তিনি এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন যুরোপীয় তাহাতে উপস্থিত ছিলেন না। এলবার্ট হলে সভাধিবেশন হয় এবং উপস্থিত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা প্রায় এক শত। ব্লাণ্ট সুরেন্দ্রনাথের ও আনন্দমোহনের বক্তৃতার প্রশংসা করিয়াছেন।

এই ব্লাণ্ট সেই সময় ভারতবর্ষের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া মত প্রকাশ করিাছেন, ভারতবর্ষের কাম্য—স্বায়ত্ত-শাসন, অর্থাৎ কেবল শাসন-ক্ষমতা নহে, পরন্তু আইন প্রণয়নের ও আয়ব্যয়ের ক্ষমতাও ভারতবাসীকে দিতে হইবে—

"What India really asks for as the goal of her ambitions is self-goverment—that is to say, that not merely executive but lagistative and financial power should be vested in the native hands."

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ববৎসর সুরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার রাজনীতিক কার্য্যে উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করেন। তিনি এ বার লাহোর, অমৃতসর, মুলতান, রাওয়ালপিণ্ডী, আম্বালা, দিল্লী, আগ্রা, আলিগড়, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, এলাহাবাদ, বারাণসী ও বাঁকিপুরে যাইয়া সভা ও বক্তৃতা করেন। খণ্ড ভারতের স্থানে মহাভারত প্রতিষ্ঠার কল্পনা যে এই পরিভ্রমণ-ফলে পুষ্ট হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

প্রথম Indian National Conferenceএর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় ইহার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। প্রথম দিন (মহারাজা) দুর্গা-চরণ লাহা ও দ্বিতীয় দিন (উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ জমীদার) জয়কৃষ্ণ মুখো-পাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে বাঙ্গালা ব্যতীত

যেমন মিরাট, বারাণসী ও এলাহাবাদ হইতে প্রতিনিধি-সমাগম হইয়াছিল, তেমনই আবার বিহারের মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহ (দ্বারবঙ্গ), ও বোম্বাইয়ের বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলিক উপস্থিত ছিলেন। আবার ইংরাজ সিভিলিয়ান কটনও উপস্থিত ছিলেন ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য, যে সময় কলিকাতায় এই সভার অধিবেশন হইতেছিল, সেই সময়েই বোম্বাই সহরে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছিল।

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যে তাহার প্রতিনিধি-রূপ সপ্রকাশ হয় নাই, তাহা আমরা পরে দেখাইব। কলিকাতায় তাহার দ্বিতীয় অধিবেশনেই কংগ্রেস প্রকৃত প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং সেই বৎসর হইতে আর কনফারেন্সের অধিবেশন হয় নাই। কনফারেন্সের এই দ্বিতীয় অধিবেশনেই প্রস্তাব হয়, কেবল কলিকাতায় ইহার অধিবেশন না হইয়া ভবিষ্যতে ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে অধিবেশন হইবে। কংগ্রেসেই সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয়।

এই কনফারেন্সের দুষ্প্রাপ্য কার্য্যবিবরণ আমরা বিশেষ মূল্যবান বলিয়া মনে করি। কারণ :—

[১] ইহাতে দেখিতে পাই, তখন বাঙ্গালার—ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেরও নানা স্থানে রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে সকল সভা হইতে প্রতিনিধি সমাগম হইয়াছিল, সে সকলের নাম—কাশী সার্ব্বজনিক সভা, মিরাট এসোসিয়েশন, ভবানীপুর (কলিকাতা) সুবার্বাণ রেট-পেয়ার্স এসোসিয়েশন, মেদিনীপুর ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, পূর্ব্বস্থলী (বর্দ্ধমান) হিতকরী সভা, ভাজনঘাট (নদীয়া) শাখা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়ে-

শন, সেনহাটি (খুলনা) এসোসিয়েশন, পাবনা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, টাকী (২৪ পরগণা) শাখা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, বাগেরহাট (খুলনা) পিপল্‌স এসোসিয়েশন, কানাইপুর (ফরিদপুর) শাখা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, রামজীবনপুর (মেদিনীপুর) শাখা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, চুঁচুড়া (হুগলী) ওয়েল-উইসিং ক্লাব, উড়িষ্যা পিপল্‌স এসোসিয়েশন (কটক), কাটদহ (নদীয়া) এসোসিয়েশন, বের-বনগ্রাম (পাবনা) শাখা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, বৈদ্যবাটী (হুগলী) পিপল্‌স এসোসিয়েশন, রাজসাহী এসোসিয়েশন, ব্রাহ্মণবেড়িয়া (ত্রিপুরা) পিপল্‌স এসোসিয়েশন, গেঁয়োখালি (মেদিনীপুর) শাখা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ঘাটাল (মেদিনীপুর) ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, মৈমনসিং এসোসিয়েশন, ফরিদপুর পিপল্‌স এসোসিয়েশন, জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ) ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, মহিশাদল (মেদিনীপুর) শাখা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, বর্দ্ধমান ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, কালনা (বর্দ্ধমান) ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন।

[২] তখন বোম্বাইয়ে, মান্দ্রাজে, এলাহাবাদে ও আজমীরে সভা হইতেছিল। সুরেন্দ্রনাথ বলেন—"Indeed, all India seemed at the present moment to have met in solemn conclave to think out the great problem of national advancement."

[৩] কলিকাতার ৩টি প্রতিষ্ঠান একযোগে এই কনফারেন্স আহ্বান করিয়াছিলেন :—

(ক) বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন

(খ) ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন

(গ) সেণ্ট্রাল মেহমেডান এসোসিয়েশন

এই অধিবেশনে যে প্রস্তাবে ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সদস্য-সংখ্যা মোট সদস্য-সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ করিবার কথা বলা হয়, বাঙ্গালা সরকারের কর্ম্মচারী মিষ্টার কটন তাহা সমর্থন করেন এবং ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অম্বিকাচরণ মজুমদার বক্তৃগণের মধ্যে ছিলেন। এ বিষয়ে যথাকর্ত্তব্য করিবার জন্য যে সমিতি গঠিত হয়, মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহ (দ্বারবঙ্গ) মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, (মহারাজা) দুর্গাচরণ লাহা, (রাজা) রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি তাহার সদস্য ছিলেন। শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সভাপতি জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অস্ত্র আইনের প্রতিবাদ-প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। জয়কৃষ্ণ বাবুই সরকারের ব্যয়সঙ্কোচ প্রস্তাব করিয়া ব্যয়বাহুল্যের কারণ নির্ণয় করেন—

[১] সামরিক বিভাগের ব্যয় অত্যন্ত অধিক এবং সৈনিক-প্রতি ব্যয় ফ্রান্সে ও জার্ম্মাণীতে ঐরূপ ব্যয়ের দ্বিগুণ।

[২] বিলাতে এ দেশ হইতে প্রভূত অর্থ প্রেরিত হয় এবং রৌপ্য-মুদ্রা ব্যবহারকারী ভারতবর্ষকে স্বর্ণ-মুদ্রায় দেয় দিতে হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

[৩] এ দেশের লোক যে সব কায সুসম্পন্ন করিতে পারে, সেই সব কাযে বিদেশী নিয়োগ করায় ব্যয়াধিক্য ঘটে।

[৪] য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীদিগকে অত্যধিক বেতন প্রদান করা হয়।

তিনি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের হিসাব সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালার ছোট লাটের শাসনাধীন স্থানে (অর্থাৎ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায়) য়ুরোপীয় ও ভারতীয়-দিগের চাকরীর সংখ্যা প্রদান করেন—

বিভাগ	সর্ব্বোচ্চ বেতন	ভারতীয়দিগের সর্ব্বোচ্চ বেতন	মাসিক ২ শত টাকা ও তাহার অধিক বেতনে কতগুলি চাকরীতে য়ুরোপীয় নিযুক্ত	মাসিক ২ শত টাকা বা তাহার অধিক বেতনের কয়টি পদে ভারতীয় অবস্থিত
	টাকা	টাকা		
ডাক	২,০০০	৬০০	৩০	১০
রেলের ডাক	১,৪০০	৩০০	৫	১
কাষ্টমস	২,০০০	৬০০ অপেক্ষা অল্প	১০	০
প্রিভেণ্টিভ ও লবণ	১,০০০	১০০ অপেক্ষা অল্প	১০০ টাকা হইতে ১১০ জন	০
বন	১,২৫০	২০০	১৩	০
অহিফেন	৩,০০০	১০০ অপেক্ষা অল্প	১০০ টাকা হইতে ৯ জন	০
জেল	২,০০০	ঐ	১১	০
অর্থ	৩,০০০	৭৬০	৪	২
পুলিস	২,৫০০	৫০০	১০৮	৭
শিক্ষা	২,৩০০	১,০০০	৫১	২৭

এই সময়ে বাঙ্গালায় সংবাদপত্রের বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তখন 'ইণ্ডিয়ান মিরার' ইংরাজী দৈনিক পত্র—নরেন্দ্রনাথ সেন তাহার সম্পাদক; 'হিন্দু পেট্রিয়ট,' 'বেঙ্গলী' ও 'অমৃত বাজার' তখন ইংরাজী সাপ্তাহিক। তখন কলিকাতায় ইংরাজ-পরিচালিত দৈনিকপত্রের মধ্যে 'ষ্টেটস্‌ম্যান বাঙ্গালী ধনীর অর্থ-সাহায্যে পরিচালিত ও ভারতীয়ের আশার ও আকাঙ্ক্ষার সমর্থক; 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' ও 'ইংলিশম্যান' ইংরাজ সম্প্রদায়ের মুখপত্র।



যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

'বঙ্গবাসী' তখন তরুণ সম্প্রদায়ের মুখপত্র ও দেশীয়-ভাবের প্রচারক। 'বঙ্গবাসীর' প্রচার ও প্রতাপ তখন অত্যন্ত অধিক এবং সেই জন্য তাহার বহুদিন পরেও পল্লীগ্রামে অল্পশিক্ষিত লোকরা সংবাদপত্র বলিলে 'বঙ্গবাসী' বুঝিত। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর পরিচালনে 'বঙ্গবাসী' যখন সমাজ-সংস্কারের বিরোধী ও সনাতনী মত প্রচার আরম্ভ করেন, তখনই দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি 'সঞ্জীবনী' প্রচার করেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর পরিচালনে 'বঙ্গবাসী' হিন্দুর মুখপত্র হয় এবং 'বঙ্গবাসীর' দ্বারা দেশে "শাস্ত্র প্রকাশে" যে কার্য্য সাধিত হয়, তাহা অসাধারণ। যোগেন্দ্র

চন্দ্রের 'বঙ্গবাসীর' দ্বারা যেমন এই কার্য্য সাধিত হয়, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের "বসুমতী সাহিত্য মন্দির" তেমনই সাহিত্য প্রচারে যুগান্তর প্রবর্ত্তিত করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।



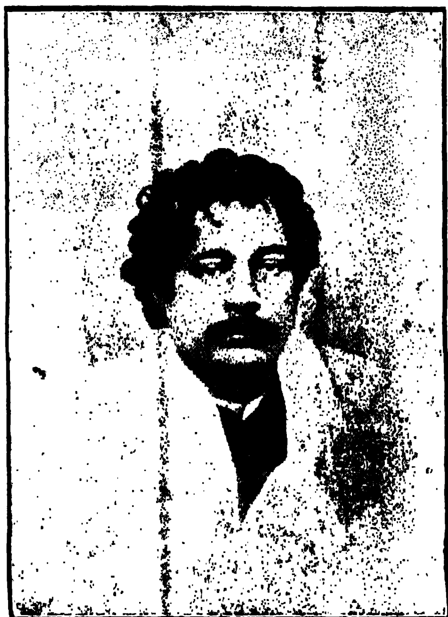
কৃষ্ণকুমার মিত্র

এই সময়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় 'পতাকা' পত্র প্রচার করেন এবং তাহা সর্ব্বতোভাবে জাতীয়তার প্রচার করিতে থাকে। পরে 'পতাকা' 'সুরভির' সহিত সম্মিলিত হয়। কিন্তু 'সুরভি' ও 'পতাকা' দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয় নাই।

'সঞ্জীবনী' ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র বলিয়া দেশে আশানুরূপ আদর লাভ করে নাই। ইহার গাম্ভীর্য্যও ইহার বহুল প্রচারে অন্তরায় হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে। এই পত্র পীড়িতের ও পিষ্টের পক্ষ সমর্থন করে এবং চা-বাগানে কুলীদিগের দুর্দ্দশা দূর করিতে বিশেষ সাহায্য করে। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাবধি 'সঞ্জীবনী' কংগ্রেসের সমর্থন করিতে থাকে এবং ইহার পরিচালকরা সকলেই কংগ্রেসের কর্ম্মী ছিলেন। ইহার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের প্রস্তাবেই বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বিলাতী পণ্য বর্জ্জন হয় এবং কৃষ্ণকুমার বাবু বিনাবিচারে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন।

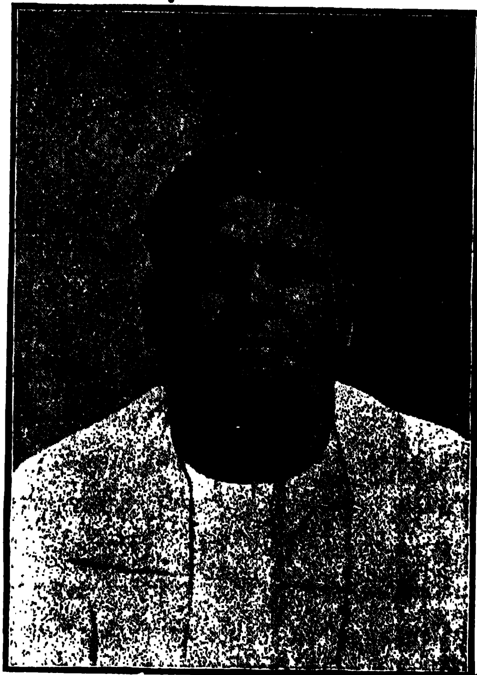
এই স্থানে একটু পরবর্ত্তী কথার উল্লেখ করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব। কংগ্রেস যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বিলাতের ব্যবস্থানুসারে মিষ্টার হিউম বাঙ্গালায় তাহার প্রচারকল্পে সংবাদপত্রের সাহায্য প্রয়োজন বুঝিয়া

সেই সাহায্য লাভের আয়োজন করেন। 'বঙ্গবাসী' তখন বিদেশী প্রথায় পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানের সমর্থন করিতে অসম্মত এবং হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ-প্রচারকার্য্যেই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ফলে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে যৌথ কারবার হিসাবে 'হিতবাদী' প্রচারিত হয়। ইহার ম্যানেজিং এজেণ্টরা ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে যে বিবৃতি প্রচার করেন, তাহাতে স্পষ্টই লিখা হইয়াছিল, ইহা লাভের জন্য প্রচারিত হয় নাই—দেশপ্রেমের জন্যই হইয়াছিল (Patriotism not profit was the only object)। ইহার অংশীদারদিগের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার আর, এল, দত্ত, জানকীনাথ ঘোষাল, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন। বিজ্ঞবর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ইহার সম্পাদকের কার্য্য করিতে থাকেন—তাঁহাকে গাড়ীর খরচ বাবদ মাসিক যে ৫০ টাকা দিবার কথা ছিল, তাহাও দেওয়া ঘটে নাই। শেষে তাঁহার বন্ধুদিগের সহিত একযোগে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ইহা গ্রহণ করিলে ইহার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়।



উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাঙ্গালায় 'হিতবাদী' বঙ্গভাষায় পরিচালিত পত্রগুলির মধ্যে কংগ্রেসের প্রধান প্রচারপত্র হয়। পরে যখন মধ্যপন্থী ও জাতীয়পন্থী দুই দলের মতভেদ প্রবল হয় তখন 'হিতবাদী' মধ্যপন্থীদলের সমর্থক হইয়া দাঁড়াইলে 'বসুমতী' জাতীয় দলের প্রধান পত্র হয়। এই সময় প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ইহার সম্পাদক। বাঙ্গালায় এই সকল পত্রের দ্বারা দেশাত্মবোধ প্রচারের কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে; সুতরাং জাতির রাজনীতিক ইতিহাসে ইহাদিগের উল্লেখ শ্রদ্ধা সহকারে করিতে হয়।



সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

এই সঙ্গেই আমরা বাঙ্গালায় যাত্রার ও রঙ্গালয়ের উল্লেখ করিব। বাঙ্গালার রঙ্গালয়ে প্রথমাবধি ধর্ম্মাত্মক ও দেশপ্রেমাত্মক নাটক অভিনীত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী যুগে বাঙ্গালা রঙ্গালয়ে অভিনীত বহু নাটকের প্রচার ও অভিনয় নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কথকতার মত যাত্রাও বাঙ্গালায় লোকশিক্ষার অন্যতম সহজ উপায়। এই যাত্রার দ্বারা কিরূপে দেশীয় ভাব প্রচারে সাহায্য হইয়াছে, তাহার প্রমাণে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মনোমোহন বসুর "দিনের দিন সবে দীন" ও "নরবর নাগেশ্বর"—যে সব গানের প্রচার নিষিদ্ধ হইয়াছে, সে সব নিষিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে প্রায় ৩০ বৎসর 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকে যাত্রায় গীত হইয়া বাঙ্গালার সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিল। শিক্ষিতদিগের মত অশিক্ষিতরাও এই সব গান গাহিতেন এবং তখন এ সব নিষিদ্ধ হয় নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই সময়ের সাহিত্যও পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যের মত জাতীয় ভাবের প্রভাবসম্পন্ন। রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাস চতুষ্টয়ের উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। প্রায় সেই সময়ের আর একখানি উপন্যাস উল্লেখযোগ্য—সেই বিরাট উপন্যাস 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়'। উপন্যাস হিসাবে যেমনই কেন হউক না—তাহার উল্লেখ এই স্থানে করিতে হয়। পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম ছিল না; কিন্তু সকলেই জানেন, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ তাহার লেখক। চণ্ডীচরণ সেনের উপন্যাসগুলি ইংরাজ শাসন-কালের ঘটনা লইয়া লিখিত। তাঁহার 'অযোধ্যার বেগম,' 'নন্দকুমারের ফাঁসী' প্রভৃতি উপন্যাসের প্রচার এখন নিষিদ্ধ হইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায়, সে সকলের পরিশিষ্টে ইংরাজের রচনা হইতে কোম্পানীর আমলের ইংরাজদিগের ব্যবহার সম্বন্ধে যে সব উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছিল, সেই সকলই আপত্তিজনক বিবেচিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রের সময় যে ভাব প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই ভাব-প্রচার-কার্য্যে কখন বিরত হয় নাই। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' 'ইণ্ডিয়ান মিরার,' 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ও 'বেঙ্গলী'র প্রচার-ফলে পরে 'নিউ ইণ্ডিয়া' ও তাহার পরে 'বন্দে মাতরম' প্রকাশ স্বাভাবিক

নিয়মে সম্ভব হইয়াছিল। যেমন 'বঙ্গবাসী' 'সঞ্জীবনী 'পতাকা' ও 'বসুমতীর প্রচারফলে পরে শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর 'প্রতিবেশী'ও তাহার পরে যুগ-সন্ধ্যায় উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' প্রকাশ স্বাভাবিক নিয়মে সম্ভব হইয়াছিল, তেমনই বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, মনোমোহন প্রভৃতির রচনাফলে পরে রবীন্দ্রনাথের, দ্বিজেন্দ্রলালের, রজনী-কান্তের রচনা বাঙ্গালা সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়াছিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

কংগ্রেসের প্রথম বিংশবর্ষ।

কংগ্রেসের আরম্ভের ইতিহাস নাই—সে ইতিহাস রচনার উপযোগী উপকরণেরও অভাব। তাহার কারণ, যাঁহারা ইহার প্রতিষ্ঠাতা তাঁহারা কেহই প্রতিষ্ঠা-বিবরণ বিবৃত করেন নাই। প্রতিষ্ঠাতারাও ইহাকে ইহার বর্ত্তমান রূপ প্রথমে প্রদান করেন নাই। গঙ্গার প্রবাহ হিমাচলের মধ্যে কোথা হইতে অথবা কোন্ কোন্ স্থান হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা স্থির করা যেমন দুষ্কর—এইরূপ প্রতিষ্ঠানের আরম্ভ আবিষ্কার করাও সেইরূপ। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছু কাল পরে নরেন্দ্রনাথ সেন 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রে লিখিয়াছিলেন,



নরেন্দ্রনাথ সেন

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজে থিয়জফিক্যাল সোসাইটীর যে সভা হয়, তাহাতে

নানা স্থান হইতে যে সব লোক আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে কয়জন ও তাঁহাদিগের বন্ধুরা—১৭ জন—দাওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাওয়ের গৃহে সমবেত হইয়া যে আলোচনা করেন, তাহারই ফলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ঐ আলোচনা সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদিগের নামও প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

মান্দ্রাজ হইতে—ডাক্তার সুব্রহ্মণ্য আয়ার, রঙ্গিয়া নাইডু ও আনন্দ চালু

কলিকাতা হইতে—নরেন্দ্রনাথ সেন. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোমোহন ঘোষ

বোম্বাই হইতে—বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলিক, কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং ও দাদাভাই নৌরজী

পুণা হইতে—বিজয়রঙ্গ মুদেলিয়ার ও পাণ্ডুরঙ্গ গোপাল

বারাণশী হইতে—সর্দ্দার দয়াল সিংহ

এলাহাবাদ হইতে—হরিশ্চন্দ্র

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে—কাশীপ্রসাদ ও পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ

বাঙ্গালা হইতে— চারুচন্দ্র মিত্র

অযোধ্যা হইতে—শ্রীরাম

আরও এক জন লেখক মাদ্রাজে এই সম্মিলনকে কংগ্রেসের আরম্ভ বলিয়াছেন। মান্দ্রাজের সাংবাদিক জি, পরমেশ্বরণ পিলে তাঁহার Indian Congressmen নামক পুস্তিকায় বলিয়াছেন, হিউমকে যদি কংগ্রেসের জনক বলা যায়, তবে জানকীনাথ ঘোষালকে তাহার জননী বলিতে হয়; যদিও বোম্বাই কংগ্রেসেরজন্ম স্থান বলিয়া পরিচিত, তথাপি ইহার জননী তাহা ভাল জানেন—তিনি মাদ্রাজে ময়লাপুর পল্লীতে বৃহৎ সরোবরতীরস্থ গৃহটি দেখাইয়া থাকেন—"How fondly Mr. Ghosal points to the white storied building on the western side of

the big tank in Mayalapore as the scene of his early labours".

কিন্তু নরেন্দ্রনাথ প্রদত্ত তালিকায় জানকীনাথের নাম নাই। কেবল তাহাই নহে—মাদ্রাজের এই সভায় সুরেন্দ্রনাথ যে উপস্থিত ছিলেন না, তাহা তাঁহার স্মৃতিকথা পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। মনোমোহনও যে তাহাতে উপস্থিত ছিলেন, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। সর্দ্দার দয়াল সিংহ বারাণসী হইতে ও চারুচন্দ্র মিত্র বাঙ্গালা হইতে যাইবার কোন কারণ দেখা যায় না; সর্দ্দার সাহেব পঞ্জাবের লোক। চারুচন্দ্র এলাহাবাদের অধিবাসী নীলকমল মিত্রের পুত্র।

সম্ভবতঃ বহুদিন পরে স্মৃতির সাহায্যে লিখিবার সময় নরেন্দ্রনাথ ভুল করিয়াছিলেন। তবে, এ কথা মনে করা যাইতে পারে যে, মাদ্রাজে এই সভায় ভারতবর্ষে একটি জাতীয় সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছিল।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার হিউমের মনে হয়, ভারতবর্ষের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যদি প্রতিবৎসর সমবেত হইয়া সামাজিক প্রশ্নের আলোচনা করেন, তবে তাহাতে সুফল ফলিতে পারে। তিনি সে সভায় রাজনীতিক আলোচনার পক্ষপাতী ছিলেন না; কারণ, তাঁহার বিশ্বাস ছিল তাহা হইলে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের রাজনীতিক সমিতিগুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। তিনি সরকারী ও বে-সরকারী সম্প্রদায়ে সমধিক সদ্ভাব স্থাপনোদ্দেশ্যে স্থির করেন, যে বার যে প্রদেশে সভাধিবেশন হইবে, সে বার সেই প্রদেশের শাসক সভাপতি হইবেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এই প্রস্তাব তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডাফরিণকে জানাইলে তিনি তাহার ত্রুটি দেখাইয়া বলেন, বিলাতে যেমন যখন এক রাজনীতিকদল মন্ত্রী

হইয়া কায করেন, আর এক দল প্রতিপক্ষ থাকেন—এ দেশে তেমনই যদি ভারতীয় রাজনীতিকরা Oppositionএর কায করেন, তবে সুফল ফলিবে। "এ দেশের সংবাদপত্রে দেশের লোকের মত প্রতিফলিত হইলেও, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা যায় না। আবার তাঁহাদিগের ও তাঁহাদিগের অনুসৃত নীতি সম্বন্ধে ভারতবাসীদিগের মনোভাব ইংরাজরা জানিতে পারেন না। এই অবস্থায় ভারতীয় রাজনীতিকরা যদি বৎসর বৎসর সভায় সমবেত হইয়া শাসন-প্রণালীর ত্রুটি দেখাইয়া দেন, ও ত্রুটি সংশোধনের উপায় নির্দ্দেশ করেন, তবে তাহাতে শাসিত ও শাসক উভয় সম্প্রদায়েরই উপকার হয়।" লর্ড ডাফরিণ সভায় প্রাদেশিক শাসককে সভাপতি করিবার প্রস্তাবেরও প্রতিবাদ করেন; কারণ, তাঁহার সম্মুখে সকলে সকল কথা স্পষ্টভাবে বলিতে কুণ্ঠা বোধ করিতে পারেন। মিষ্টার হিউম তাঁহার পূর্ব্বরচিত প্রস্তাব ও লর্ড ডাফরিণের প্রস্তাব নানা স্থানে রাজনীতিকদিগকে জানাইলে তাঁহারা লর্ড ডাফরিণের প্রস্তাবই গ্রহণ করেন।

এই স্থানে বলা যাইতে পারে, ইহার পরে লর্ড ডাফরিণ যখন কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতেছিলেন, তখনই তিনি শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব বিলাতে পাঠাইয়াছেন। তবে সে প্রস্তাব তাঁহার মতানুযায়ী, সুতরাং ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ নহে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে স্থির হয়, ২৪ শে হইতে ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে পুণায় ভারতের নানা স্থানের প্রতিনিধিদিগের এক সম্মিলন হইবে এবং তাহাতে ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ প্রতিনিধিরা সম্মিলিত হইবেন। সম্মিলনের প্রধান উদ্দেশ্য:—

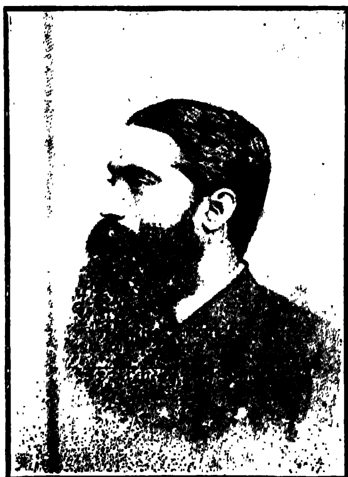
(১) জাতীয় উন্নতিকল্পে যাঁহারা পরিশ্রম করিতেছেন, দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সেই সকল কর্ম্মীকে পরস্পরের সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ প্রদান এবং

(২) পরবৎসর কি রাজনীতিক কায করা হইবে, তাহার আলোচনা ও নির্দ্ধারণ।

পরোক্ষভাবে ইহার ফলে এ দেশে পার্লামেণ্টের বীজ উপ্ত হইবে এবং ভারতবর্ষ যে প্রতিনিধিমূলক শাসনের অনুপযুক্ত—সে মতের অসারত্ব প্রতিপন্ন হইবে—এ আশাও ছিল।

বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও বাঙ্গালা হইতে ২০ জন হিসাবে এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা ও পাঞ্জাব হইতে তাহার অর্দ্ধাংশ হিসাবে প্রতিনিধি যাইবেন, আশা ছিল। মিষ্টার চিপলংকার প্রভৃতি সার্ব্বজনীন সভার সদস্যরা অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত করিয়া পুণায় সব ব্যবস্থা করিবার ভার গ্রহণ করেন।

সভাধিবেশনের পূর্ব্বে নগরে বিসূচিকার প্রাদুর্ভাবে অধিবেশন-স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হয় এবং বোম্বাইয়ে সভাধিবেশন হয়।


উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এই অধিবেশনে প্রতিনিধি-সংখ্যা, বোধ হয়, ৭২ হইবে। বাঙ্গালা হইতে সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত উপস্থিত ছিলেন—নরেন্দ্রনাথ সেন, জানকীনাথ ঘোষাল ও 'নববিভাকর' সম্পাদক গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়। পুণায় ভারত-ভৃত্য সমিতি প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্বে বাঙ্গালায় এই যুবক গিরিজা বাবু

ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া রাজনীতিক প্রচারকের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

সভাপতি মহাশয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ ৪ ভাগে বিভক্ত করেন :—

(১) ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যাঁহারা দেশের কায করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন ;

(২) পরিচয়ফলে জাতিগত, ধর্ম্মগত ও প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার যথাসম্ভব দূরীকরণ এবং লর্ড রিপণের শাসন-কালে যে জাতীয় ঐক্যের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহার পরিপুষ্টি সাধন ;

(৩) আবশ্যক সামাজিক ব্যাপারে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মত-নির্দ্ধারণ ;

(৪) পরবর্ত্তী দ্বাদশ মাসে ভারতীয় রাজনীতিকগণের কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকরণ।

অধিবেশনে ৯টি প্রস্তাব গৃহীত হয় :—

(১) এ দেশে ও বিলাতে ভারত-শাসন-বিষয়ক অনুসন্ধান জন্য একটি রয়াল কমিশন নিযুক্ত করা হউক ; সে কমিশনে উপযুক্ত পরিমাণ ভারতীয় সদস্য গ্রহণের এবং কমিশন যাহাতে ভারতে ও বিলাতে সাক্ষ্য গ্রহণ করেন তাহার ব্যবস্থা করা হউক।

(২) ভারত-সচিবের পরামর্শ পরিষদের উচ্ছেদ সাধন করা হউক।

(৩) নির্ব্বাচিত সদস্য গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সংস্কার করা হউক।

(৪) বিলাতের মত এ দেশেও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হউক।

(৫) সামরিক বিভাগের বর্ত্তমান ব্যয় অনাবশ্যক ও রাজস্ব-তুলনায় অত্যধিক।

(৬) যদি সামরিক বিভাগের ব্যয় হ্রাস করা অসম্ভব হয়, তবে অতিরিক্ত ব্যয় কাষ্টম্‌স শুল্ক ও পরে লাইসেন্স করের দ্বারা নির্ব্বাহিত হউক।

(৭) কংগ্রেসের মতে "আপার" ব্রহ্ম অধিকার অনাবশ্যক। কিন্তু সরকার যদি তাহা অধিকার করাই স্থির করেন, তবে সমগ্র ব্রহ্ম দেশকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সিংহলের মত উপনিবেশ গঠিত করাই সঙ্গত।



রাজেন্দ্রলাল মিত্র

(৮) কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবগুলি প্রাদেশিক রাজনীতিক সভাসমিতির গোচর করা হউক।

(৯) পরবর্ত্তী অধিবেশন ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৮ শে ডিসেম্বর তারিখ হইতে কলিকাতায় হইবে।

এই সব প্রস্তাবের মৃদুতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু বিলাতের 'টাইমস' পত্র ইহাতেও বিরক্ত হইয়া উঠেন।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন—কলিকাতায়। এ বার কংগ্রেসে নানা স্থান হইতে নির্ব্বাচিত ৪৩৬ জন প্রতিনিধি ; রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ; সভাপতি—দাদাভাই নৌরজী।

রাজা রাজেন্দ্রলালের পাণ্ডিত্য-খ্যাতি তখন আর ভারতেই আবদ্ধ নহে, পরন্তু য়ুরোপেও ব্যাপ্ত হইয়াছে। এই অধিবেশনে সভাপতি বলেন—"কংগ্রেস রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান।"

যুবক রবীন্দ্রনাথ এই অধিবেশনের উদ্বোধনে গান করিয়াছিলেন :—

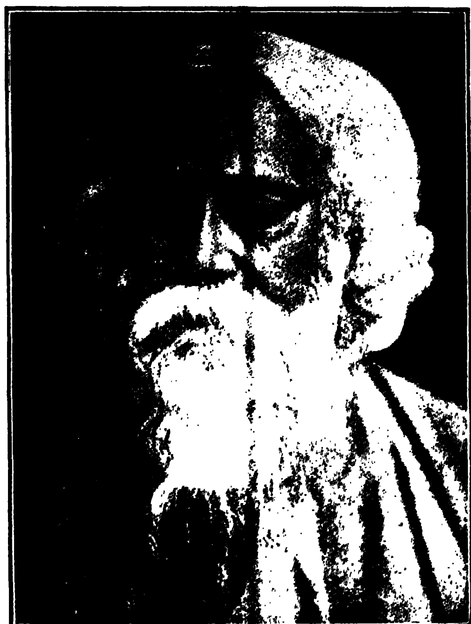
আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে !
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে ?
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে,
আয় বলে ওই ডেকেছে কে !
সেই গভীর স্বরে উদাস করে
আর কে কারে ধরে রাখে !

যখন থাকি যে সেখানে,
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
সেই প্রাণের টানে টেনে আনে—
প্রাণের বেদন জানে না কে ?

মান অপমান ঘুচে গেছে,
নয়নের জল গেছে মুছে,

নবীন আশে হৃদয় ভাসে
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে

কত দিনের সাধন-ফলে
মিলেছি আজ দলে দলে ;
ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয় রে মা'কে।



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই সময় বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে আশা ও আনন্দের উচ্ছ্বাস লক্ষিত হইয়াছিল। হেমচন্দ্র তাঁহার "রাখি-বন্ধন" কবিতায় তাহা প্রকাশ করেন :—

কি আনন্দ আজ ভারত-ভুবনে
ভারত-জননী জাগিল !

আহা কি মধুর নবীন সুহাসি,
মায়ের অধরে রয়েছে প্রকাশি,
যেন বা প্রভাতী কিরণের রাশি
উষার কপোলে জ্বলিল !

মরি কি সুষমা ফুটেছে বদনে,
কিবা জ্যোতি জ্বলে উজল নয়নে,
কি আনন্দে দিক পূরিল !
ভারত-জননী জাগিল !

পূরব বাঙ্গালা মগধ বিহার
দেরাইসমাইল হিমাদ্রির ধার
করাচি মান্দ্রাজ সহর বোম্বাই
সুরাটী গুজরাটী মহারাঠী ভাই
চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল ;

প্রেম আলিঙ্গনে করে রাখি কর
খুলে দেছে হৃদি হৃদি পরস্পর ;
একপ্রাণ সবে, এক কণ্ঠস্বর—
মুখে জয়ধ্বনি ধরিল ।

প্রণয়-বিহ্বলে ধ'রে গলে গলে
গাইল সকলে মধুর কাকলে,
গাহিল—"বন্দেমাতরম্ ;
সুজলাং সুফলাং, মলয়জ-শীতলাং
শস্য-শ্যামলাং মাতরম্;

শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনীং
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিনীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।"
উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়-স্বরে;
ভারত-জগত মাতিল।
—ইত্যাদি।

এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটি কথার উল্লেখ করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। 'সাধনা' পত্রিকায় "বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গ" প্রবন্ধে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছিলেন, (কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে) তিনি একদিন বঙ্কিমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন—"গিয়া দেখি, অনেকগুলি সাহিত্যসেবীর সমাগম


দাদাভাই নৌরজী

হইয়াছে। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বাবু, নবীন বাবু প্রভৃতি। নবীন বাবু কথায় কথায় 'আনন্দমঠের'সুপরিচিত 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতটীর একাংশ আবৃত্তি করিয়া বঙ্কিম বাবুকে বলিলেন, এমন ভাল জিনিষটিকে আধসংস্কৃত আধবাঙ্গালায় লিখিয়া মাটী করা হইয়াছে। এ যেন গোবিন্দ অধিকারীর গানের মত। লোকের ভাল লাগে না। বঙ্কিমবাবু ঈষৎ কুপিত স্বরে বলিলেন,—'আচ্ছা ভাই, ভাল না লাগে পড়ো না। আমার ভাল লেগেছে, তাই ওরকম লিখেছি। লোকের ভাল লাগবে কি না ভেবে আমি লিখব!" বাস্তবিক বঙ্কিমচন্দ্রের এই গানটি সম্বন্ধে বিশেষ মত ছিল। দীনবন্ধু বাবুর পুত্র লিখিয়াছেন, তিনি এক বার বলিয়াছিলেন, পরে লোক ইহার মর্য্যাদা বুঝিবে। নবীন বাবুকে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতেও তাহাই মনে হয়। কারণ, বঙ্কিম বাবুর মত সাহিত্য-শিল্পীর অজ্ঞাত ছিল না —কোন শিল্পী কখন আপনি আনন্দ লাভ করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না—"Dimly in the background of their mind, throughout their work they must have some ideal recepient in view—an ideal recepient, the counterpart of themselves, capable of fully perceiving the beauty it is their aim to render, capable of thrilling responsive to the thrill of conception that they themselves experienced." বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রেরণাবশে এই মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, তখন কি তাঁহার মনে সত্য সত্যই ভারতের সেবক সন্তানদিগের ত্যাগসমুজ্জল মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে নাই? তখন এই মহাগীত বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে কিরূপ আদর লাভ করিয়াছিল, তাহা হেমচন্দ্রের কবিতায় ভারতের জয়ধ্বনি রূপে ইহার উল্লেখেই বুঝিতে পারা যায়।

এই সময় হিউম কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বুঝাইবার অভিপ্রায়ে কতকগুলি পুস্তিকা প্রচার করেন—The Rising Tide, The Star in the East, The Old Man's Hope.

কিন্তু কংগ্রেস যত প্রবল হইতে থাকে, ততই ইহার বিরোধীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে থাকেন। যে লর্ড ডাফরিণ কংগ্রেসের কল্পনার স্রষ্টা বলিয়া পরিচিত, তিনি এক ভোজে ইহাকে "অজ্ঞাত রাজ্যে লম্ফ" এবং কংগ্রেস কর্ম্মীদিগকে microscopic minority বলিয়া অভিহিত করেন এবং উত্তর-পশ্চিম (বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশ) প্রদেশের ছোট লাট সার অক্‌ল্যাণ্ড কলভিন কেবল স্বনামে ও ভিঙ্গার রাজা উদয়প্রতাপ সিংহের নামে কংগ্রেসকে আক্রমণ করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই ; পরন্তু এলাহাবাদে অধিবেশনের উদ্যোগীরা যাহাতে উপযুক্ত স্থান লাভ করিতে না পারেন, সে চেষ্টারও ত্রুটি করেন নাই। ইহা কিরূপ মনোবৃত্তির পরিচায়ক, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।



বদরুদ্দিন তায়াবজী

কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন মাদ্রাজে। ইহাতে প্রতিনিধি-সংখ্যা— ৬০৭ ; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সার তাঞ্জোর মাধব রাও ; সভাপতি—বোম্বাইয়ের বদরুদ্দীন তায়াবজী। এই অধিবেশনে যেমন প্রথম মুসলমান সভাপতিপদে বৃত হয়েন, তেমনই আবার য়ুরেশিয়ান সম্প্রদায়ের একাধিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ইহাতে যোগ দেন। এই অধিবেশনে যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, সে সকলের মধ্যে কংগ্রেসের নিয়ম, এ দেশে সামরিক

শিক্ষালয় স্থাপন ও তাহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয়দিগকে সামরিক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা, দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান কল্পে কারীগরী বিদ্যালয় স্থাপন ও সরকারী প্রয়োজনে দেশীয় পণ্যের ব্যবহার-বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য।

অধিবেশনে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়—অধিবেশনের পূর্ব্বে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকার্য্য পরিচালন। এই প্রচার-কার্য্যের ফলে ৮ হাজার লোকের নিকট হইতে মোট ৫ হাজার ৫ শত টাকা সংগৃহীত হয়। দাতৃগণের মধ্যে কেহ কেহ ১আনা মাত্রও দিয়াছিলেন। যিনি যাহা



পণ্ডিত অযোধ্যানাথ

সাধ্য দিয়াছিলেন। আর ত্রিবাঙ্কুরের, মহীশূরের ও কোচিনের রাজন্যগণও অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন।

চতুর্থ অধিবেশনের স্থান—প্রয়াগ; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, সভাপতি—জর্জ্জ ইউল; প্রতিনিধি সংখ্যা—১,২৪৮। রাজপুরুষরা কংগ্রেসের পক্ষে অধিবেশনের স্থানলাভে যে বাধা দিয়াছিলেন, অযোধ্যানাথ তাহা দূর করিয়া কংগ্রেসকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। তিনি সঙ্কল্প গোপন রাখিয়া লক্ষ্ণৌয়ের কোন নবাবের সম্পত্তি লাউদার কাসল এক দিনের মধ্যে ভাড়া লইয়া তথায় অধিবেশন-ব্যবস্থা করেন। এলাহাবাদে ইহার পরবর্ত্তী অধিবেশনের জন্য মহারাজা সার লক্ষ্মীশ্বর সিংহ (দ্বারবঙ্গ) ঐ গৃহ ক্রয় করিয়া কংগ্রেসের ব্যবহারের জন্য প্রদান করেন। এই তেজস্বী জমীদার রাজপুরুষদিগের বিরক্তির ভয়ে ভীত না হইয়া কংগ্রেসকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সেজন্য এ দেশের লোক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

এই অধিবেশনে কংগ্রেস সম্বন্ধে রাজপুরুষদিগের ব্যবহারের নিন্দা করা হয় এবং ইহাতে লবণের শুল্ক আলোচিত হয়। এই শুল্ক সম্বন্ধে বহুদিন পরেও মার্কিনের রাজনীতিক ব্রায়েন বলেন,— "It is specially burdensome to the poor" এবং "the poverty of the people of India is distressing in the extreme."



জর্জ্জ ইউল

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের অধিবেশনের স্থান—বোম্বাই; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—ফিরোজশা মেটা; সভাপতি—সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ;

প্রতিনিধি সংখ্যা—১,৮৮৯। এ বার কংগ্রেস-কর্ম্মীদিগের অনুরোধে বিলাতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ মিষ্টার ব্রাডল অধিবেশনে যোগ দিতে আসিয়াছিলেন। পার্লামেণ্টে অর্থনীতিবিদ্ হেন্‌রী ফসেট ভারত-কথার আলোচনা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কংগ্রেস-কর্ম্মীরা ব্রাডলকে ভারতবর্ষের বিষয়ে অবহিত করিবার চেষ্টা করেন। ব্রাডল দরিদ্রাবস্থা হইতে নিজ চেষ্টায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন প্রথম পার্লামেণ্টে সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েন, তখন নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসসম্পন্ন বলিয়া প্রচলিত প্রথানুসারে "শপথ" গ্রহণে অসম্মত হইলে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক পার্লামেণ্ট গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিতে হয়। শেষে কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার মতানুসারেই কায করিতে দিতে হইয়াছিল।


উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ

মিসেস বেসাণ্ট নাস্তিক মত গ্রহণ করিয়া ব্রাডলর সঙ্গে একযোগে কায করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহারাই বিলাতে ' লোকসংখ্যা দমন-প্রয়োজন বুঝাইবার জন্য ম্যালথাসের মত প্রচার করেন। খৃষ্টান দেশে তাহাতে বাধা দেওয়া হয়; কিন্তু আদালতের বিচারে তাঁহাদিগেরই জয় হয়। তাঁহার আগমনের জন্য যে এবার অধিবেশনে প্রতিনিধি-সমাগম অধিক হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়;

তাহাতে বলা হয়—বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে সদস্যদিগের অর্দ্ধাংশ প্রজাদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত, এবং এক-চতুর্থাংশ সরকারী কর্ম্মচারী ও এক-চতুর্থাংশ সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন।

এই অধিবেশনে প্রথম সাম্প্রদায়িকতার মেঘ ভারতের রাজনীতিক গগনে লক্ষিত হয়। তখন তাহা জাতীয়তার পবনের প্রাবল্যে সঞ্চিত হইতে পারে নাই বটে, কিন্তু পুঞ্জীভূত হইয়া প্রলয়-সূচনা করিতেছে। শাসন-সংস্কার প্রস্তাবে অযোধ্যার মুন্সী হিদায়ৎ রসুল এক সংশোধক প্রস্তাব করেন—সকল ব্যবস্থাপক সভাতেই মুসলমান সদস্য-সংখ্যা হিন্দু সদস্য-সংখ্যার সমান থাকিবে। লক্ষ্ণৌ সহরের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার হামিদ আলী খাঁ এই সংশোধক প্রস্তাবে, অনৈক্য ও অবিশ্বাসের কারণ হইবে বলিয়া, আপত্তি করেন। সংশোধক প্রস্তাব বহুমতে ত্যক্ত হয়।

এই অধিবেশনে প্রথম কয় জন মহিলা প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। আর এই অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বিলাতে কংগ্রেসের কার্য্যের প্রশংসা শুনা যায় এবং তথায় কায করিবার জন্য ৪৫ হাজার টাকা ব্যয় নির্দ্দিষ্ট করা হয়। ইহার পর বিলাতে কংগ্রেস কমিটী গঠিত হয় ও 'ইণ্ডিয়া' নামে এক পত্র কংগ্রেসের মুখপত্ররূপে প্রচারিত হইতে থাকে। প্রথমে মিষ্টার ডিগবী এই কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হয়েন। এই ব্যবস্থার ফলে উমেশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আর, এন, মুধলকার, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর্ডলে নর্টন ও মিষ্টার হিউম বিলাতে বহু সভায় বক্তৃতায় ভারতবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা বিলাতের লোকের গোচর করেন। বিলাতে রাজনীতিকদিগকে আহ্বান করিয়া ভারতবাসীর রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষার আলোচনাও প্রবর্ত্তিত হয়।

ব্রাডল আশা দিয়া যায়েন, তিনি পার্লামেণ্টে ভারতে শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে এক আইন পেশ করিবেন। তিনি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষাও

করিয়াছিলেন ; কিন্তু বিলাতের সরকারের পক্ষে লর্ড ক্রশ এক আইন পেশ করিয়া তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ করেন। ব্রাডলর আইন নানা সভায় সমর্থিত হয়। ক্রশের আইন ভারতবাসীর আশানুরূপ হয় নাই। ইহার অল্পদিন পরে বিলাতে ব্রাডলর মৃত্যু হয়। তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইলে তিনি যে উত্তর দেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন—"For whom shall I work, if not for the people? Born of the people, trusted by the people, I will die for the people."



রমেশচন্দ্র মিত্র

তাঁহার উপস্থিতি অধিবেশনে অসাধারণ উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল। ইহার পরবর্তী অধিবেশন—কলিকাতায়। এ বার সভাপতি বোম্বাইয়ের

ফিরোজশা মেটা। হাই কোর্টের জজীয়তী হইতে অবসর প্রাপ্ত সার রমেশ-চন্দ্র মিত্রকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি করিবার প্রস্তাব হয় বটে. কিন্তু তিনি অসুস্থতাহেতু সম্মত হইতে পারেন নাই। ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ সে পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম তখন সুপরিচিত। তিনি দীনের বন্ধু—পুলিস চালানী মোকদ্দমায় তিনি কিরূপে পুলিসের সাজান মিথ্যা প্রমাণ চূর্ণ করিয়া আসামীকে আদালতের বিচারে অব্যাহতি দেওয়াইতেন, তাহার পরিচয় পাইয়া বিলাতের লোকও স্তম্ভিত হইয়াছিল। মুলুকচাঁদের মামলার বিবরণ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বিলাতে প্রকাশিত হয়, আর শ্যামাচরণ পালের মামলার বিবরণ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তথায় প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত পুস্তকের ভূমিকায় কুমারী এলিজা অর্ম্ম লিখেন—সংপ্রতি মনোমোহনের মৃত্যু হইয়াছে,



ফিরোজশা মেটা

—"His loss will be keenly felt by all who are interested in the Indian reforms, which he did so much to further, and the present work has a peculiar value as one of the last of his many attempts to bring the facts of Indian

administration within the knowledge of English legislators and electors:"

এই সব ঘটনার বহুদিন পরেও পুলিস কমিশন পুলিসের যে সব ত্রুটির উল্লেখ করেন, সে সকল পাঠ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এই মনোমোহনই প্রথম প্রাদেশিক সম্মিলনে বাঙ্গালায় বক্তৃতার দ্বারা জনসাধারণকে রাজনীতিক কার্য্যে অবহিত করাইবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

সরকারী কর্ম্মচারীরা যে কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কলিকাতায় এই অধিবেশনে তাহা বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ছোট লাটের ও তাঁহার গৃহস্থ ব্যক্তিদিগের ব্যবহারার্থ কয়খানি প্রবেশপত্র প্রেরিত হইয়াছিল। সেগুলি প্রত্যর্পণ করিয়া ছোট লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী লিখেন, ভারত সরকারের নির্দ্দেশ এই যে, কোন রাজকর্ম্মচারীই এইরূপ সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। বাঙ্গালা সরকার নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপনও সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন :—

যে সব সরকারী কর্ম্মচারী কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাদিগের অনেকের নিকটে কংগ্রেস-মণ্ডপে প্রবেশের জন্য প্রবেশপত্র প্রেরিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া বাঙ্গালা সরকার সকল বিভাগের সেক্রেটারীদিগের ও তাঁহাদিগের অধীনস্থ বিভাগসমূহের প্রধান কর্ম্মচারীদিগের নিকট পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন, ভারত সরকারের প্রচারিত আদেশানুসারে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের পক্ষে দর্শকরূপেও কংগ্রেসে উপস্থিত থাকা সঙ্গত নহে—কংগ্রেসের মত কোন সভায় যোগদান একেবারেই নিষিদ্ধ।

এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া কংগ্রেসে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং প্রস্তাবানুসারে এ বিষয় বড় লাটের গোচর করিলে বড় লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী জ্ঞাপন করেন—বাঙ্গালা সরকার ভারত সরকারের নির্দ্দেশের সম্যক অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলেন ; কংগ্রেসের

কার্য্যে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের যোগদান নিষিদ্ধ, ইহাই ভারত সরকারের নির্দ্দেশ। আরও বলা হয়—সরকারের মতে কংগ্রেস আইন-সঙ্গত প্রতিষ্ঠান—য়ুরোপে যাহাকে more advanced Liberal party বলে, এ দেশে কংগ্রেস তাহাই।

এই ব্যাপারে বুঝা যায়, কংগ্রেস তখনও সরকারের সহযোগের জন্য আগ্রহশীল। কংগ্রেসে গৃহীত কোন প্রস্তাবেও স্বাবলম্বনের ভাব তখনও লক্ষিত হইত না।

পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনে, অন্ততঃ এক শত প্রতিনিধি লইয়া, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বিলাতে অধিবেশনের যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন-কাল আসন্ন বলিয়া এ বার তাহা ত্যক্ত হয়। কিন্তু স্থির হয়, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক 'ইণ্ডিয়া' পত্র লইয়া অগ্রিম দুই কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।



শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়

এই অধিবেশনে প্রথম একজন মহিলা বক্তৃতা করেন। ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ইহার পরবৎসরের অধিবেশন—নাগপুরে; প্রতিনিধি-সংখ্যা—৮১২; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—নারায়ণস্বামী নাইডু; সভাপতি—আনন্দ

চার্লু। এ বার পণ্ডিত অযোধ্যানাথকে সভাপতি করিবার প্রস্তাব হইলে তিনিই মান্দ্রাজের কোন কর্ম্মীকে সভাপতি করিতে বলেন এবং ডাক্তার সুব্রহ্মণ্য আয়ার হাই কোর্টের জজ নিযুক্ত হওয়ায় সে পদ গ্রহণ করিতে না পারিলে আনন্দ চার্লুকে সভাপতি করা হয়। ইনি যেমন সুরসিক, তেমনই যুক্তিতে পরিপক্ক; আবার নিজমত ব্যক্ত করিতে তেমনই দৃঢ়তাসম্পন্ন ছিলেন। এই অধিবেশনে দৃঢ়তাসহকারে সামরিক ব্যয়বাহুল্যের প্রতিবাদ করা হয়।


আনন্দ চার্লু

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন— এলাহাবাদে; প্রতিনিধি-সংখ্যা—৬২৫; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ; সভাপতি—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অযোধ্যানাথ নাগপুরের অধিবেশনে পরবৎসরের জন্য এলাহাবাদে কংগ্রেস আহ্বান করিয়াছিলেন। অসুস্থ শরীরে গুরুশ্রমে কাতর অবস্থায় নাগপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনি পীড়িত হয়েন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এই অধিবেশনে সভাপতি প্রতিপন্ন করেন, সমাজ-

সংস্কারের সহিত রাজনীতিক অধিকারের কোন সম্বন্ধ নাই। তিনি বলেন, বিচার ও শাসন বিভাগদ্বয়ের বিচ্ছেদ সাধন, ভূমি-রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তন, বন বিভাগের আইনের পরিবর্ত্তন—এ সকলের সহিত কি সমাজ-সংস্কারের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে? আমাদিগের বিধবারা পুনরায় বিবাহ করেন না, আমাদিগের বালিকারা—অন্যান্য দেশের বালিকাদিগের তুলনায়—অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিবাহিতা হয়, আমাদিগের পত্নী ও দুহিতারা আমাদিগের সহিত যানারোহনে বন্ধুগৃহে গমন করেন না, আমরা দুহিতৃগণকে অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাই না বলিয়া কি আমরা রাজনীতিক অধিকার লাভের অযোগ্য?" তিনি বলেন, বিশেষ বিবেচনা করিয়াই কংগ্রেসের কার্য্যতালিকা হইতে সমাজ-সংস্কার বর্জ্জন করা হইয়াছিল,—সেই জন্য "the Congress commenced and has since remanied 'and will, I sincerely trust, always remain a purely political organisation."

এই অধিবেশনের পূর্ব্বে লর্ড ক্রশের আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল এবং তাহাতে ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচনের দ্বার সঙ্কীর্ণ হইলেও—মুক্ত হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী অধিবেশন পঞ্জাবে। প্রথমে কথা ছিল, অমৃতসরে অধিবেশন হইবে; পরে কিন্তু লাহোরেই অধিবেশন হয়। এ বার প্রতিনিধি সংখ্যা—৮৬৭. অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—সর্দ্দার দয়াল সিংহ মাজিথিয়া; সভাপতি—দাদাভাই নৌরজী। তিনি তখন পার্লামেণ্টে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

এই অধিবেশনের পূর্ব্বে পার্লামেণ্টে বিলাতের মত এ দেশেও সিভিল সার্ভিসের জন্য পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। পরে কিন্তু সেই প্রস্তাবানুসারে কায হয় নাই।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের অধিবেশনের স্থান—মান্দ্রাজ; প্রতিনিধি-সংখ্যা ১,১৬৩;



আলফ্রেড ওয়েব

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—রঙ্গিয়া নাইডু; সভাপতি বিলাতের পার্লামেণ্টের এক জন আইরিশ সদস্য—মিষ্টার আলফ্রেড ওয়েব। সভাপতি তাঁহার বক্তৃতার শেষাংশে বলেন:—সকল জাতির ও সকল ধর্ম্মাবলম্বী মানব আপন আপন উৎপত্তি-স্থানের কথা বিস্মৃত হইয়াও প্রেমের দ্বারা সম্মিলিত হইতে পারে—

"Might be combined, yet not forget
The fountains whence they rose,
As, filled by many a rivulet
The stately Ganges flows."

তিনি দেখান, বিদেশের জন্য ভারতের রাজস্বের যে অংশ ব্যয়িত হয়, তাহা ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ১৭ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা অর্থাৎ রাজস্বের শতকরা ২৩ ভাগ ছিল, আর ১০ বৎসরে বর্দ্ধিত হইয়া ২২ কোটি ৯১ লক্ষ ১০ হাজার টাকায় অর্থাৎ রাজস্বের শতকরা ২৫ ভাগ হইয়াছে!

এই অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বলেন—"সরকার বিদেশী হওয়ায় এ দেশের বিশেষ আর্থিক ক্ষতি হয়। অতিপুষ্ট সামরিক বিভাগের

ব্যয়ে দেশের রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ ব্যয়িত হইয়া যায় ; বলপূর্ব্বক এ দেশে অবাধ বাণিজ্য নীতির প্রবর্ত্তনে দেশের পুরাতন শিল্পসমূহ বিলুপ্ত হইয়াছে * * দেশের দারিদ্র্য বৎসর বৎসর বর্দ্ধিত হইতেছে।”

যে পুণায় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইবার কথা ছিল, তথায় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এ বার প্রতিনিধি-সংখ্যা--১,৫৮৪ ; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—রাও বাহাদুর ভিড়ে ; সভাপতি--সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই অধিবেশনে পুণার মুসলমানরা যোগ দেন নাই। কিন্তু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বলেন, যে সব উপাদানে জাতি গঠিত হয়, সে সবই আমাদিগের আছে। সত্য বটে, আমাদিগের মধ্যে আজও জাতিগত ও ধর্ম্মগত বৈষম্য বিদ্যমান ; কিন্তু এখন আমরা পরস্পরের সম্বন্ধে সহিষ্ণুতা-শীল ; কংগ্রেসের বৈদ্যুতিক শক্তিতে আমাদিগের মিলন আরও দৃঢ় হইবে ; ইহাতেই কংগ্রেসের গৌরব। কংগ্রেসের মূলমন্ত্র এই যে, আমরা প্রথমে ভারতবাসী, পরে হিন্দু, মুসলমান, পার্শি, খৃষ্টান, পঞ্জাবী, মারহাট্টী, বাঙ্গালী, মাদ্রাজী।

এই বার তিলক প্রমুখ জাতীয় দল কংগ্রেস-মণ্ডপে সমাজ-সংস্কার বিষয়ক সমিতির অধিবেশনের বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা কংগ্রেসকে সামাজিক ব্যাপারের বিতর্ক হইতে দূরে রাখিতেই সচেষ্ট ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের অভিভাষণ সুদীর্ঘ—নানা প্রসঙ্গে পূর্ণ—প্রমাণ-প্রয়োগে মনোরম, অথচ তাহাতে তাঁহার বক্তৃতাশক্তির স্ফূর্ত্তিও অসাধারণ।

সুরেন্দ্রনাথের শক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি সেই সুদীর্ঘ অভিভাষণ—মুদ্রিত পুস্তিকা না দেখিয়া, স্মৃতি হইতে বলিয়াছিলেন এবং সভাভঙ্গের পর সেই দিনই যে প্রাঙ্গণে খিরকীর যুদ্ধ হইয়াছিল তথায় এক বিরাট জনসভায়

বক্তৃতা করেন। তাঁহার কণ্ঠস্বরের বৈশিষ্ট্যে উচ্চারিত উক্তি সকলেই শুনিতে পাইয়াছিলেন।

এই অধিবেশনে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের প্রতি কুব্যবহারের ও এ দেশের রেলে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের নানা অসুবিধার বিষয় আলোচিত হইয়াছিল।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে অধিবেশন কলিকাতায় (বিডন বাগানে)। তাহাতে প্রতিনিধি-সংখ্যা—৭৮৪; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—সার রমেশচন্দ্র মিত্র; সভাপতি—রহিমতুল্লা মহম্মদ সিয়ানী। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অসুস্থতার জন্য রাসবিহারী ঘোষ তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।


রহিমতুল্লা মহম্মদ সিয়ানী

বহু মুসলমান যে কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার কথায় সভাপতি মুসলমানদিগের কংগ্রেসে যোগদানে আপত্তির ১৭টি কারণের উল্লেখ করিয়া যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করেন—সে সব অসার।

এই অধিবেশনেও দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের লাঞ্ছনার প্রতিবাদ করা হয়।

যোড়া সাঁকোর ঠাকুর পরিবার প্রতিনিধিদিগকে এক সম্মিলনে আপ্যায়িত করেন। সেই সম্মিলন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের—

"অয়ি ভুবন মনোমোহিনি !"

গানটি রচিত হয়।

নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে অমরাবতীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। তখন এক দিকে প্লেগে ও দুর্ভিক্ষে দেশ বিপন্ন, আর এক দিকে রাজনীতিক গগনে ঘনঘটা। বোম্বাইয়ে ২ জন য়ুরোপীয় রাজপুরুষ নিহত হইয়াছেন। বিনাবিচারে নাটু ভ্রাতৃদ্বয়কে নির্ব্বাসিত করিয়া সরকার নিজ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। বালগঙ্গাধর তিলক রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। বোম্বাই তখন এমনই ভীতি-বিক্লব যে, বাঙ্গালার নেতারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া তিলকের পক্ষ-সমর্থন জন্য কলিকাতা হইতে ব্যবহারাজীব পাঠাইয়াছিলেন। তিলক মোকর্দ্দমার পূর্ব্বে শিশিরকুমার ঘোষকে লিখিয়াছিলেন :—

"লোকের কাছে আমার প্রভাব ও সম্ভ্রম আমার চরিত্রের উপর নির্ভর করে। আমি যদি (আমার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত) অভিযোগে ভয় পাই, তবে আমার পক্ষে (দেশবাসীর শ্রদ্ধায় বঞ্চিত হইয়া) মহারাষ্ট্রে বাসে ও আন্দামানে বাসে প্রভেদ থাকিতে পারে না। আমরা বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কু-অভিসন্ধি হৃদয়ে পোষণ করিতে পারি না। তবে যাঁহারা রাজনীতিচর্চ্চা করেন, তাঁহাদিগের বিপদের সম্ভাবনা অনিবার্য্য। সরকার পুণার নেতৃগণকে অপমানিত করিতে চাহেন। আমি (ক্ষমাপ্রার্থণাকারী) গোখলের বা 'জ্ঞান-প্রকাশ' পত্রের সম্পাদকের মত কাঁচা কায করিব না। আমরা দেশের জনগণের সেবক ; বিপদ্‌কালে শোচনীয় ভীরুতা দেখাইয়া তাহাদিগের হতাশ করিতে পারি না। তাহাতে তাহাদিগের অনিষ্ট সাধন করা হইবে।"

এই স্থানে গোপালকৃষ্ণ গোখলের ক্ষমা প্রার্থনার কথা বলিব। তিনি বাঙ্গালার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বোম্বাইয়ের সার দীনশা ওয়াচা ও মাদ্রাজের জি, সুব্রহ্মণ্য আয়ারেরই সঙ্গে বিলাতে ওয়েলবী কমিশনে ভারত শাসনের ব্যয় সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতে গিয়াছিলেন। তখন বোম্বাই প্রদেশে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। প্লেগ নিবারণকল্পে যে সব ব্যবস্থা হয়, সে সকল পরিচালনের কঠোরতায় দেশের লোক উৎপীড়িত হইয়া যেন ক্ষিপ্ত হয়। সেই সময় দুই জন ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীর হত্যায় চণ্ডনীতি অবলম্বিত হয়। সে সব কথা সম্বন্ধে গোখলে মহাশয়ের গুরুস্থানীয় হাই কোর্টের জজ কংগ্রেসের শ্রদ্ধেয় কর্ম্মী অর্থনীতিক মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে বিলাতে শিষ্যকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তিনি বিলাতে কোন সাংবাদিককে সে সব সংবাদ দেন ও সে সকল বিলাতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এ দিকে বোম্বাই সরকার সে জন্য তাঁহাকে মামলা-সোপর্দ্দ করিবার সঙ্কল্প করেন এবং কোনরূপে সে সংবাদ বিলাত হইতে প্রত্যাগমন কালে এডেনে ওয়াচা মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হয়। তাঁহার পরামর্শে গোখলে তথায় রাণাড়ে মহাশয়ের পত্রগুলি নষ্ট করেন—পাছে গুরুর অনিষ্ট হয়। জাহাজ বোম্বাইয়ে আসিলেই সরকারী কর্ম্মচারী জাহাজে যাইয়া গোখলেকে বিলাতে প্রচারিত তাঁহার উক্তি প্রমাণ করিতে বলেন। গোখলে প্রমাণ সংগ্রহ করিবার সুযোগ পাইবেন না মনে করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

অভ্যর্থনা সমিতি সভাপতি গণেশ শ্রীকৃষ্ণ খপর্দ্দের অভিভাষণের পর সভাপতি সার শঙ্করণ নায়ার তাঁহার অভিভাষণে সে সময়ের অবস্থা ব্যক্ত করেন। তাহার স্থূল কথা :—

দেশের দূরবস্থার অন্ত ছিল না। দারিদ্র্য এ দেশে লোকের স্বাভাবিক অবস্থা; তাহা দুর্ভিক্ষে পরিণতি লাভ করিয়াছিল। তাহার উপর বোম্বাইয়ে মহামারীর আবির্ভাব। প্লেগ দমনের জন্য সরকার যে উপায় অবলম্বন

করেন, তাহা লোকের পারিবারিক ব্যবস্থার বিরোধী বলিয়া লোকের ভয় হয়। সত্য হউক আর না-ই হউক, লোকের মনে বিশ্বাস জন্মে, যে সব সৈনিক প্লেগ দমন-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা মহিলাদিগকে অপমানিত ও দেবস্থান কলুষিত করিয়াছিল। লোক নিরাশ হইয়া পড়ে। প্রতীচীতে এ অবস্থায় আইন-ভঙ্গ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইত। যাঁহারা এই সব ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন, সর্দ্দার নাটু তাঁহাদিগের অন্যতম। বিলাতে তাঁহার যে অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সত্য হইলে ব্যাপার ভীষণই হইয়াছিল। সৈনিকরা নাকি গৃহস্থের অনুপস্থিতিকালে অকারণে দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিত। ধনসম্পত্তি নিরাপদ ছিল না। অভিযোগ করিলে ফল হইত না। এক জন সৈনিক নাকি এক জন হিন্দু মহিলাকে প্রহার করে। নাটু সাক্ষী লইয়া সে কথা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিলেও কেহ সে কথায় কর্ণপাত করে নাই। বরং কেহ অভিযোগ উপস্থাপিত করিলে মনে করা হইত, তিনি কার্য্যে বাধা প্রদান করিতেছেন। নাটু অভিযোগ উপস্থাপিত করাইতে, বোধ হয়, তাঁহার মন্দির কলুষিত করা হয়। নাটু এ সব কথা রাজকর্ম্মচারীদিগকে জানান। দেশীয় সংবাদপত্রে এই সব কথা



শঙ্করণ নায়ার

আলোচিত হয় এবং 'মার্হাট্টা' লিখেন, "যাহারা সহরে প্রভুত্ব করিতেছে, তাহাদিগের তুলনায় প্লেগ ভাল।" অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার সংবাদপত্রগুলি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন—তিলক সরকারের নীতির প্রতিবাদ করায় তাঁহাকে দণ্ড দিতে বলেন। তিলকের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা উপস্থাপিত করা হয় এবং নাটু ভ্রাতৃদ্বয়কে বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত করিয়া লোকের স্বাধীনতার অসারত্ব প্রতিপন্ন করা হয়। তিলকের বিচার হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি য়ুরোপীয় হইলে সে—ইংরাজের প্রজা হউক বা না হউক—চাহিলেই জুরীর অর্দ্ধাংশ য়ুরোপীয় হয়। ভারতবাসীর সে অধিকার নাই। সরকারের পক্ষ হইতে জুরারদিগের নামে আপত্তি করিয়া ৯ জন জুরারের মধ্যে ৬ জন য়ুরোপীয় করান হয়। ফলে ৬ জন জুরার তিলককে দোষী ও ৩ জন নিরপরাধ বলেন। একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদক এই কথা বলিয়া সংবাদপত্র বন্ধ করেন যে, রচনার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে ডেপুটী কমিশনারের গৃহে যাইবার কোন প্রয়োজন তাঁহার নাই।

এই সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে বিলাত প্রসিদ্ধ সাংবাদিক মিষ্টার ষ্টেড লিখেন—

(১)—"The attempt to enforce sanitary measures of precaution against the plague has led to much angry discontent among the natives, who regard sanitation as a craze of the white man, and who bitterly resent interference with their domestic privacies which it involves. This discontent suddenly crystallised in the assassination of Lieutenant Ayerst and Mr. Rand at Poona.······A mistake may have been made in employing British soldiers instead of natives in enforcing laws which are distasteful to the prejudices and customs of the native population······There

is a zeal for sanitation which leads men to sanction a kind of persectuion that is every whit as indefensible as the Inquisition."

(২)—"The Government has prosecuted newspapers and agitators who have been circulating inflammatory appeals calculated to excite feelings of disaffection towards the Government. Prosecutions are always regarded in this country as a sign of weakness on the part of the prosecuting Government……The action of the Indian Government, however, in searching newspaper offices and arresting editors should help to make some of our Pharisees a little more lenient when judging the press policy of the Russian Government."

আজও যে সব অতিরিক্ত ক্ষমতামূলক আইন প্রত্যাহৃত হয় নাই, সেই সকলের প্রতিবাদ-প্রস্তাব অধিবেশনে বাঙ্গালার সুরেন্দ্রনাথ উপস্থাপিত করেন। সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা-প্রসঙ্গে যখন বালগঙ্গাধর তিলকের কথার উল্লেখ করিয়া বলেন "তাঁহার জন্য সমগ্র জাতি আজ অশ্রুবর্ষণ করিতেছে," তখন বাঙ্গালার অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক প্রতিনিধিদিগের দৃষ্টান্তে বহু প্রাতনিধি দণ্ডায়মান হইয়া তিলকের জয়ধ্বনি করেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন মান্দ্রাজে। সে বার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—সুব্বারাও পান্তলু: সভাপতি—আনন্দমোহন বসু। সভাপতির অভিভাষণে বিনা বিচারে লোককে আটকের ও শিক্ষাবিভাগে প্রবর্ত্তিত নূতন ব্যবস্থার প্রতিবাদ করা হয়। সেই অভিভাষণে রমেশচন্দ্র দত্তের উক্তি

উদ্ধৃত করা হয়—পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসরে বৃটিশ ন্যায়পরতায় ভারতবাসীর বিশ্বাস যত বিচলিত হইয়াছে, তত আর কখন হয় নাই।



আনন্দমোহন বসু

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে অধিবেশনের স্থান—লক্ষ্ণৌ। তাহাতে প্রতিনিধি-সংখ্যা ৭৩৯; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—বংশীলাল সিংহ; সভাপতি—রমেশচন্দ্র দত্ত।

সভাপতি এ দেশে দুর্ভিক্ষের কারণ বিশেষরূপে সন্ধান করিয়াছিলেন। তাঁহারই সমালোচনা-ফলে লর্ড কার্জ্জনের সরকার ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করেন এবং সে সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়েন। সভাপতি মহাশয় বলেন—

"এ দেশের কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইবে। তাহাদিগের দারিদ্র্য; দুঃখ ও ঋণের জন্য তাহারা দায়ী নহে। কেহ কেহ বলেন, এ দেশে জন-সংখ্যার অতি-বৃদ্ধি হেতু দারিদ্র্যের ও দুর্ভিক্ষের উদ্ভব হয়। তাহা সত্য নহে। বিলাতের ও জার্ম্মানীর তুলনায় এ দেশের জনসংখ্যা অধিক বর্দ্ধিত হয় না। আবার কেহ কেহ বলেন, ভারতের কৃষক অমিতব্যয়ী, নির্ব্বোধ—তাই সে দরিদ্র। এ কথাও সত্য নহে। জগতে আর কোথাও এমন মিতব্যয়ী, সঞ্চয়শীল কৃষক সম্প্রদায় নাই। সে যে অত্যধিক সুদে ঋণ গ্রহণ করে, সে কেবল অল্প সুদে টাকা পায় না বলিয়া। বাঙ্গালা প্রভৃতি কয়টি স্থান ব্যতীত আর সব প্রদেশে ভূমি-রাজস্ব এত অধিক যে,

প্রজার দারিদ্র্য অবশ্যম্ভাবী। বিলাতের সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদিগের সব শিল্প নষ্ট হইয়াছে। কাযেই কৃষিই দেশের লোকের একমাত্র অবলম্বন হইয়াছে। ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ এত অধিক যে, কৃষক সঞ্চয় করিতে পারে না।”

এই অধিবেশনে কংগ্রেস সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম গৃহীত হয়।

পরবর্ত্তী অধিবেশনের স্থান—লাহোর; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—কালীপ্রসন্ন রায়; সভাপতি—নারায়ণ চন্দ্রাবরকর। কালীপ্রসন্ন যে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন, তাহাতেই তখনও পঞ্জাবে বাঙ্গালীর প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। নারায়ণ চন্দ্রাবরকর সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার হাইকোর্টের জজ পদে নিয়োগ-সংবাদ প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ সেই জন্য তাঁহার অধিবেশনে যতটা সতর্কতা ও সংযম ছিল, ততটা তেজ ছিল না।


নারায়ণ চন্দ্রাবরকর

এই অধিবেশনে ভূপেন্দ্রনাথ বসুর বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, আমরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইতে ও আন্দোলন করিতে না পারি, তবে

আমাদিগের শিল্পও নষ্ট হইবে। তিনি বলেন—আর কোন্ দেশ বিদেশী শিল্পের সুবিধার জন্য আপনার শিল্পের উপর শুল্ক স্থাপন করিতে বাধ্য হয়?

১৯০১ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন কলিকাতায় (বিডন বাগানে)। এ বার প্রতিনিধি-সংখ্যা—৮৯৬; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—মহারাজা জগদিন্দ্র-নাথ রায়; সভাপতি দীনশা ওয়াচা। এই অধিবেশনে সার রমেশচন্দ্র মিত্র ও মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। রানাড়ে সরকারের চাকরীয়া ছিলেন; কিন্তু তিনি কংগ্রেসের কার্যে পরামর্শ দাতৃগণের প্রধান দলে ছিলেন। সমাজ-সংস্কার সম্মিলনের কার্য্যব্যপদেশে তিনি কংগ্রেসে আসিতেন এবং পরামর্শ দিতেন।



দিনশা ওয়াচা

সভাপতির অভিভাষণে ভারতের দারিদ্র্যের বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়। তিনি ডিউক অব আর্গাইলের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন, ভারতের লোকের দারিদ্র্য যেরূপ প্রবল ও বিস্তৃত, সেরূপ আর কুত্রাপি নহে।

এই অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদিগের প্রতি সরকারের দুর্ব্ব্যবহারের আলোচনা ও প্রতিবাদ করেন।

অন্য দেশের পণ্যোৎপাদনের ও রপ্তানীর ব্যবস্থা না জানায় এ দেশে অর্থনীতিক অবস্থা শোচনীয় হয়—সেই বিষয়ে দেশের লোককে সংবাদ প্রদান ও যাহাতে লোক সুবিধায় ব্যবসার জন্য টাকা পায় তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য—এই মর্ম্মে প্রস্তাব গ্রহণ করা সঙ্গত কি না, পরবর্ত্তী অধিবেশনে তাহা জ্ঞাপন জন্য এক সমিতি গঠিত হয়। ইহাকে "স্বদেশীর" আরম্ভ বলিলেও বলা যায়। সেই সমিতির সদস্যদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তি-গণের নাম উল্লেখযোগ্য—বালগঙ্গাধর তিলক, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা, লালা হরকিষণলাল।

বিলাতে কমিটীর ও 'ইণ্ডিয়া' পত্রের ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্য এই বার প্রতিনিধি দিগের প্রাবেশিক ১০ টাকার স্থানে ২০ টাকা করা হয়।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশের আমেদাবাদ নগরে কংগ্রেসের অধি-বেশন হয়। এ বার প্রতিনিধি-সংখ্যা—৪৭১; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—অম্বালাল সাকেরলাল দেশাই; সভাপতি—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে এ দেশে কাপড়ের ও সুতার কলে প্রস্তুত পণ্যের উপর শুল্কের অনাচার আলোচিত হয়। তিনি বলেন, গুজরাটের ১ কোটিরও অল্প সংখ্যক অধিবাসীর মধ্যে দুর্ভিক্ষে প্রায় ২৫ লক্ষ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। প্রতিদিন ট্রেণভরা শস্য আমদানী হইয়াছে, অথচ লোক মক্ষিকার মত মরিয়াছে—শস্য কিনিবার অর্থ তাহাদিগের ছিল না। আজ তাহাদিগের জনশূন্য জীর্ণ কুটীর ভূমিসাৎ হইয়াছে।

সভাপতি নানা বিষয়ের মধ্যে দুর্ভিক্ষের কথা বলিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য সরকারকে চারিটি উপায় অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন :—

(১) এ দেশের পুরাতন শিল্পের পুনরুদ্ধার সাধন ও নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা ;

(২) ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করা ;

(৩) যে স্থানে করভার দরিদ্রের পক্ষে দুর্ব্বহ, সে স্থানে তাহা হ্রাস করা ;

(৪) বিদেশে টাকা যাওয়া বন্ধ করা ও তজ্জন্য শাসন-পদ্ধতির আবশ্যক সংস্কার সাধন।

এই অধিবেশনে মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ সাংবাদিক জি, সুব্রহ্মণ্য আয়ার ভারতের দারিদ্র্য বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন এবং ইহা সমর্থন করিবার সময় বোম্বাইয়ের এম, কে, পেটেল বলেন, ভারতের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ :—

(১) বৃটিশ শাসনের ব্যয়বাহুল্য ;

(২) পেন্সন প্রভৃতি বাবদে বৎসর বৎসর য়ুরোপে অর্থ প্রেরণ ;

(৩) ভারতীয় শ্রমশিল্পজ পণ্যের স্থানে বিদেশী কলের পণ্যের প্লাবন ;

(৪) ম্যাঞ্চেষ্টারের ব্যবসায়ীদিগের তূলা যোগাইবার জন্য ভারতের লোকের কৃষকে পরিণতি ;

(৫) শিল্পনাশহেতু কৃষকের সংখ্যা-বৃদ্ধিতে জমীর উপর দুর্ব্বহ কর স্থাপন ;

(৬) য়ুরোপে কলের উন্নতি ও ভারতবাসীর পক্ষে প্রতিযোগিতায় পরাভব ;

(৭) রেলপথ প্রসারে সর্ব্বত্র কলের পণ্যের বিস্তার।

(৮) ভারতীয় শিল্পের জন্য সংরক্ষণ শুল্ক স্থাপন-বিরতি ;

(৯) দেশে বৈজ্ঞানিক ও শিল্প বিষয়ক শিক্ষা প্রদান-ব্যবস্থার অভাব

ইহার পরবর্ত্তী অধিবেশনের স্থান মান্দ্রাজ ; সে বার প্রতিনিধি সংখ্যা—৫৩৮ ; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—নবাব সৈয়দ মহম্মদ ; সভাপতি—বাগ্মীবর লালমোহন ঘোষ।

নবাব সাহেব প্রথমেই হিন্দুর ও মুসলমানের স্বার্থের অভিন্নতা প্রতিপন্ন করেন ; রাজনীতি সমগ্র জাতির সুখের জন্য—তাহাতে জাতিভেদ থাকিতে পারে না।

সভাপতি এক বৎসর পূর্ব্বে দুর্ভিক্ষপীড়িত, নিরন্ন, কঙ্কালসার ভারতবাসীর অর্থ ব্যয়ের—অপব্যয়ের কথা বলেন এবং এ দেশের শিল্পের জন্য সংরক্ষণ শুল্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। তিনি সামরিক বিভাগের ব্যয়-বাহুল্যের আলোচনা করেন ও বলেন,—য়ুরোপীয়ে ও ভারতবাসীতে যে সব মামলা হয়, সে সকলে অনেক স্থলে বিচার-বিভ্রাট ঘটে। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে বলেন।



হেনরী কটন

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে অধিবেশন হয়। এ বৎসর প্রতিনিধি সংখ্যা—১,০১০ ; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—ফিরোজ শা মেটা ; সভাপতি—সার হেনরী কটন। সার হেনরী বাঙ্গালার সিভিলিয়ান ছিলেন এবং লর্ড রিপনের শাসনকালে ইলবার্ট বিলের আন্দোলনে—ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলিয়া য়ুরোপীয়দিগের বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন। আসামের

চীফ কমিশনার হইয়া তিনি য়ুরোপীয় চা-করদিগের অনাচার হইতে অসহায় কুলীদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সভাপতি বলেন, কংগ্রেসের ও ভারতবাসীর রাজনীতিক উদ্দেশ্য—আমেরিকার যুক্তরাজ্যের মত ভারতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বায়ত্ত-শাসনশীল প্রদেশের প্রতিষ্ঠা। সমগ্র দেশ স্বায়ত্ত-শাসনাধীন উপনিবেশের মত বৃটেনের অধীন থাকিবে।

আমরা বলিতে পারি, এই অধিবেশনে কংগ্রেসের প্রথম পর্ব্বের শেষ। এই অধিবেশনের পর বঙ্গ-ভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালায় প্রবর্ত্তিত আন্দোলন দেশের রাজনীতির ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়। দেশাত্মবোধ যে স্বাবলম্বন ব্যতীত সার্থক হয় না, তাহা লোক বুঝিতে পারে এবং স্বদেশী আন্দোলনও সেই বিষয়ে সহায় হয়। ইহার অনিবার্য্য ফল—কংগ্রেসে গণতান্ত্রিক মতের প্রতিষ্ঠা। এই মতে অনভ্যস্ত কোন কোন পুরাতন কর্ম্মী শঙ্কিত হয়েন। তাহাদিগের মধ্যে ফিরোজশা মেটা সেই মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। এ যেন challenging the new dawn. ইহার ফল যাহা ফলিয়াছিল, তাহা পরে—সুরাটের অসমাপ্ত অধিবেশনে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সে বিষয় পরে যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

সেই যে মতের পরিবর্ত্তন, ইহাও বাঙ্গালায় উদ্ভুত হইয়াছিল এবং বাঙ্গালা হইতে অন্যান্য প্রদেশে ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছিল। সে কথা যে বারাণসীর অধিবেশনে সভাপতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে ও লালা লাজপত রায় অকুণ্ঠ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

—০—

মত—সঙ্ঘর্ষ।

এই সময় বাঙ্গালায় বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থা উপলক্ষ করিয়া তুমুল আন্দোলনের উদ্ভব হয়। শাসনের সুবিধা হইবে এই কারণ দেখাইয়া লর্ড কার্জ্জনের সরকার বাঙ্গালার পশ্চিম ভাগ বিহার ও উড়িস্যার সহিত এক প্রদেশে এবং পূর্ব্ববঙ্গ আসামের সহিত সংযুক্ত করিয়া আর এক প্রদেশে পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। ইহার ফলে হইত—বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর সংখ্যাই অল্প হইত—বিহারী, উড়িয়া, বাঙ্গালী—কেহই নেতৃস্থানীয় হইতে পারিতেন না। আর পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের প্রাধান্য হইত এবং মুসলমানরা যে রাজনীতিক আন্দোলনে হিন্দুদিগের সহিত অনেক ক্ষেত্রেই একযোগে কায করেন না, তাহা দেখা গিয়াছিল। লর্ড কার্জ্জনের মত দাম্ভিক লোক সচরাচর দৃষ্ট হয় না। একে দাম্ভিক লোক প্রতিবাদ সহিতে পারে না, তাহাতে আবার লর্ড কার্জ্জনের মনীষা সুপ্রযুক্ত না হইয়া অপপ্রয়োগই যেন ভালবাসিত।

বাঙ্গালায় দেশাত্মবোধ-বিকাশ-ফলে যে স্বাবলম্বনের ভাব প্রবল হইয়াছিল, তাহা আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় ছিল। বঙ্গভঙ্গের প্রভাবে সে সুযোগ ঘটিল। বাঙ্গালী এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে জাতীয়তার জয়ধ্বনি করিল—সে জয়ধ্বনি সিন্ধুগর্জ্জনের মত শ্রুত হইল এবং দিকে দিকে লোককে আকৃষ্ট করিল। লর্ড কার্জ্জন বিচলিত হইলেন। তিনি স্বয়ং পূর্ব্ববঙ্গে যাইয়া মুসলমানদিগকে আশ্বাস দিলেন, পূর্ব্ববঙ্গ যে স্বতন্ত্র প্রদেশ হইবে, তাহাতে মুসলমানেরই প্রাধান্য হইবে। ঢাকার হতভাগ্য নবাব খাজা সলিমুল্লা তখন আর্থিক

দুরবস্থায়—সৌরভহীন পুষ্পের মত হইয়াছেন। তিনি মুসলমানদিগকে এই বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবের সমর্থনে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে লাগিলেন। লর্ড কার্জ্জন প্রাচ্য জাতি সকলকে অসত্যপ্রবণ বলিলে—তাঁহারই রচনা হইতে তাঁহার মিথ্যানুরাগ প্রতিপন্ন করা হইল। বাঙ্গালা তখন যে নূতন রূপে দেখা গেল, তাহা রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করিয়াছেন :—

আজি বাংলা দেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হ'লে জননী!
ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোণার মন্দিরে।
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ;
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাট-নেত্র আগুণ-বরণ।
ওগো মা তোমার কি মূরতি আজি দেখিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোণার মন্দিরে।
তোমার মুক্ত কেশের পুঞ্জমেঘে লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশ-তলে রৌদ্র-বসনী!
ইত্যাদি

বাঙ্গালীর এই আন্দোলন ভাবে যেমন—পদ্ধতিতেও তেমনই সর্ব্বতোভাবে জাতীয়। হেমচন্দ্র ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসে "রাখী-বন্ধন" কল্পনা করিয়াছিলেন—আজ দুর্দ্দিনে, সরকার যখন বাঙ্গালাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে উদ্যত তখন বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে ভাই বলিয়া পরস্পরের মণিবন্ধে রাখী বাঁধিয়া কার্জ্জনের সরকারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। রাখী-স্নানের মন্ত্র—

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক
পুণ্য হউক, হে ভগবান।

বাংলার ঘর, বাংলার মাঠ,
বাংলার বন, বাংলার হাট
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক, হে ভগবান।
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক
সত্য হউক, হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন,
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান।

জুলাই মাসে সংবাদ পাওয়া গেল, ভারত-সচিব বঙ্গবিভাগ প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। ৭ই আগষ্ট কলিকাতায় এক বিরাট সভায় বিলাতী পণ্য বর্জ্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইল। নূতন অস্ত্র লইয়া বাঙ্গালী রাজনীতিক রণাঙ্গনে প্রবেশ করিল। ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ হইল। সে দিন সমগ্র বাঙ্গালায় অরন্ধন—দোকান পাট বন্ধ; কলিকাতার বাজারে খাদ্য-দ্রব্যও বিক্রীত হইল না। আনন্দমোহন বসুকে রোগশয্যা হইতে বহন করিয়া আনিয়া মিলন-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করান হইল। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলিলেন—"সেকালে কোন দেবানুগ্রহধন্য ঋষি বলিয়াছিলেন, তিনি যে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব দেখিয়াছেন, তাহাতেই তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন। আমি তাঁহার পদধূলি গ্রহণেরও যোগ্য নহি। কিন্তু আমি যে এই নূতন জাতীয় জীবনের আবির্ভাব দেখিলাম, ইহাতে আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।"

পূর্ব্ববঙ্গে ছোট লাট সার ব্যামফাইল্ড ফুলার মুসলমানদিগকে তাঁহার "সুয়ো" স্ত্রী বলিয়া অভিহিত করিলেন—মুসলমানরা তাহাতেই অনাচারী হইয়া উঠিল। এই ফুলার কি প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা দুইটি দৃষ্টান্ত দিলে বুঝা যাইবে—'

(১) আদালতের বিচারে উদয় পাটনী নামক এক ব্যক্তির ফাঁসীর আদেশ হয়। সে দয়াপ্রার্থী হইলে ফুলার তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। নিয়ম এই যে, এরূপ ব্যাপারে এমন ভাবে ফাঁসীর দিন স্থির করিয়া ভারত সরকারকে জানাইতে হয় যে, ভারত সরকার, ইচ্ছা কলিলে, ফাঁসী বন্ধ রাখিতে আদেশ দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট সময়ের ১ দিন পূর্ব্বেই ফাঁসী বন্ধ রাখিতে ভারত সরকারের আদেশ যখন পাওয়া যায়, তখন উদয়ের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। কারণ, দিন স্থির করিবার সময় সেক্রেটারী নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বেই ফাঁসীর দিন স্থির করিয়াছিলেন। এই দারুণ ত্রুটি ফুলারেব মতে "arithmetical error" মাত্র!

(২) বরিশালে "অশ্বিনীকুমার দত্ত, বার লাইব্রেরীর ও পিপলস এসোসিয়েশনের সভাপতি দীনবন্ধু মিত্র, মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ও জিলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান রজনীকান্ত দাস, জমীদার কালীপ্রসন্ন সেন ও উপেন্দ্র নাথ সেন এই ৫জন স্বাক্ষর করিয়া বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী সম্বন্ধে এক অনুরোধপত্র প্রচার করেন। ফুলারের আদেশে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে আসিতে বলায় তাঁহারা (ছোট লাটের) জাহাজে আসিলে ফুলার তাঁহাদিগকে তিরস্কার করেন। ফুলার যাহা বলেন, তাহার স্থূল কথা এই—
* * * * ঢাকার লোকের ব্যবহার এত রূঢ় যে, তাহাতে দেবতারও ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। তিনি মানুষ, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারেন না—কোন মানুষই পারেন না। লোক বিদ্রোহী হইয়াছে—তাহারা সহৃদয় কালেক্টারকেও পাতর ছুড়িয়া মারিয়াছে। লোকের এই ব্যবহারের জন্য—তাহাদিগকে

উত্তেজিত করার জন্য, তাঁহারা দায়ী। * * * * যেমন করিয়াই হউক সরকার এই অবস্থার প্রতীকার করিবেন। সে জন্য গুর্খা সৈনিক আনা হইয়াছে এবং তাঁহারাই রক্তপাতের জন্য দায়ী হইবেন। * * * বঙ্গবিভাগ ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবে না। * * * হিন্দুরা যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, সেরূপ ব্যবহার করিতে থাকিলে তিনি সেকালের শাসক সায়েস্তা খাঁ'র পথ অবলম্বন করিবেন। * * * * অনুরোধ-পত্রের শেষভাগে দেখা যায়, ফরাসী বিপ্লবের সময় ফরাসীরা যেরূপ Committee of Public Safety গঠিত করিয়াছিল—নেতারা সেইরূপ সমিতি গঠনের ব্যবস্থা করিতেছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, যেন বিদেশী পণ্যের আমদানী করা না হয়। তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে। তাঁহারা যদি তাঁহাদিগের অনুরোধপত্রের প্রত্যাহার না করেন, তবে তিনি তাঁহাদিগকে শান্তি রক্ষা করিতে বাধ্য করিবেন। তাঁহার আদেশ শাসন বিষয়ক; হাইকোর্ট তাহা রদ করিতে পারিবেন না। * * * * অশ্বিনী বাবু বলিতে যাইতেছিলেন, ছোট লাট ভুল করিয়াছেন; কারণ, কয় ছত্র পরেই নেতারা লিখিয়াছেন, লোক যেন বলপ্রকাশ না করে। কিন্তু তিনি কথা বলি-বার পূর্ব্বেই ফুলার বলেন, 'চুপ করুন। আমি যুক্তি বা উত্তর শুনিতে চাহি না। এ আদালত নহে।' ফুলার রজনী বাবুকে বলেন, তিনি যে ছোটলাটের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টীমার ঘাটে উপস্থিত হয়েন নাই, তাহা রূঢ়তার পরিচায়ক। * * * তিনি প্রথমে বলেন, বেলা ৯টার মধ্যে 'অনুরোধপত্র' প্রত্যাহার কবিতে হইবে; পরে বলেন, 'আপনারা পত্র প্রত্যাহার করিবেন কি না?' উপায়ান্তরবিহীন হইয়া নেতারা পত্র প্রত্যাহারে সম্মত হইলে, তিনি বলেন, বেলা ৯টার মধ্যে তাহা লিখিয়া দিতে হইবে। এই কথা বলিয়া তিনি সহসা আসন ত্যাগ করেন। কাগজ গুছাইয়া উঠিতে অশ্বিনী বাবুর আধ মিনিট বিলম্ব হওয়ায় ফুলার বলেন, 'উঠিয়া দাঁড়ান আপনি আবার অশিষ্ট ব্যবহার করিতেছেন।'

ইহার ঔদ্ধত্য এমনই বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, সিরাজগঞ্জের স্কুলের ছাত্ররা আন্দোলনে যোগ দিলে, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঐ বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষা দান বন্ধ করিতে বলেন। ভারত সরকার কিন্তু উঁহাকে এই পত্র প্রত্যাহার করিতে বলেন ; কারণ, তাহা না করিলে বঙ্গবিভাগ ও পূর্ব্ববঙ্গের শাসন বিষয় বিশেষভাবে সমালোচিত হইবে। ফুলার কিন্তু বলেন, তাঁহার প্রস্তাবানুসারে কায না হইলে তিনি পদত্যাগ করিবেন। বড় লাট লক্ষ্য করেন, পূর্ব্ববঙ্গের শাসন নির্ভরযোগ্য নহে এবং তাহার ফলে আরও গোল হইতে পারে। তিনি ভারত-সচিবের সহিত একমত হইয়া ফুলারের পদত্যাগ-প্রস্তাবই গ্রহণ করেন। তিনি বিলাত যাইয়া ভারত-সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিলে ভারত সচিব লর্ড মলি তাঁহার সহিত আলোচনাফলে লিখিয়াছিলেন,—তিনি "no more fitted to manage the state of things in East Bengal than am I to drive an engine."

এক দিকে সরকার যেমন লোকের মত পদদলিত করিয়া বঙ্গবিভাগ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, অপর দিকে দেশের লোক তেমনই স্থির করিল, এই দম্ভজনিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে। তাই যখন নিম্নলিখিত ইস্তাহার সভায় সভায় পঠিত হইল তখন মধ্যপন্থী ও জাতীয় দল সকলেই ইহার সমর্থন করিলেন :—

"Whereas the Government has thought fit to effectuate the partition of Bengal inspite of the universal protest of the Bengali nation, we hereby pledge and proclaim that as a people we shall do everything in our power to counteract the evil effects of the dismemberment of our Province and to maintain the integrity of our race. So help us God."

গভর্ণমেণ্ট সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রতিবাদ সত্ত্বেও যখন বঙ্গ বিভাগ করা সঙ্গত মনে করিয়াছেন, তখন আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ও ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা আমাদিগের প্রদেশ বিভাগের কুফল নষ্ট করিতে ও জাতির একতা রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। (এ কাযে) ভগবান আমাদিগের সহায় হউন।

সরকারী কর্ম্মচারীরা যেমন মনে করিতে লাগিলেন, চণ্ড নীতির দ্বারা লোকের আপত্তি চূর্ণ করিবেন, লোকের সঙ্কল্প তেমনই দৃঢ় হইতে লাগিল। কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ একটি গানে সেই ভাবটি ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবি,
আমি কি মা'র সেই ছেলে ?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পলাবে মা ফেলে ?"

মানুষের মনের যে শক্তি অজেয়, তাহার কথা যেন এ সব রাজপুরুষ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধের পর লর্ড মিলনার এইরূপ মনোভাব লইয়া যাইয়া ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন। মিশরে মিশনও দেশের লোক অসহযোগের দ্বারা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল।

অসহযোগ তখন এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, ছাত্রদিগকে সভাসমিতিতে যোগদানে বিরত থাকিবার জন্য সরকারের আদেশ প্রচার-ফলে ছাত্ররা দলে দলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিতে লাগিল। এই সময় বর্ত্তমান লেখকের এক পত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল—আমরা যদি আমাদিগের অর্থনীতিক মুক্তির উপায় করিতে পারি, তবে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থাই বা করিতে পারিব না কেন ? ১০ই নভেম্বর এক সভায় যুবক সুবোধচন্দ্র মল্লিক জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তন জন্য লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

সুবোধচন্দ্র পটলডাঙ্গার মল্লিক পরিবারের সন্তান—বিলাসে লালিত এবং বিশেষ সৌখীন বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার এই কার্য্যে তাঁহার যে দেশ-বাৎসল্য প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার স্বরূপ তখনও অনেকে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ইহার পর জাতির মুক্তি-সংগ্রামে, জাতীয়তার প্রচারকল্পে প্রতিষ্ঠিত 'বন্দেমাতরম্' পত্র পরিচালনায় তিনি অনায়াসে যে ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার গৌরব বাঙ্গালীকে ধন্য করিয়াছিল।



সুবোধচন্দ্র মল্লিক

বাঙ্গালী ভয় ভুলিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করিলেন :—

'আমি ভয় করব না, ভয় করব না।
দু'বেলা—মরার আগে—
মরব না, ভাই মরব না।

তরীখানা বাইতে গেলে
মাঝে মাঝে তুফান মেলে,
তাই বলে' হাল ছেড়ে দিয়ে
কান্নাকাটি ধরব না।

শক্ত যা' তাই সাধতে হ'বে,
মাথা তুলে' রইব ভবে,
সহজ পথে চল্‌ব ভেবে
পাঁকের পরে পড়ব না।

ধর্ম্ম আমার মাথায় রেখে,
চল্‌ব সিধে রাস্তা দেখে;
বিপদ যদি এসে পড়ে
ঘরের কোণে সরব না।"

বাস্তবিক এই আন্দোলন যে বাঙ্গালীর অন্তর হইতে উদ্গত ভাবের অভিব্যক্তি—কেবল বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদ নহে—তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়। কবি ও বক্তা—সাহিত্যিক সে সময় যে সব রচনায় বাঙ্গালীর মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সে সব রচনা জাতীয় ভাবের প্রবল প্রেরণা ব্যতীত রচিত হইতে পারে না। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দান অসামান্য। কিন্তু তিনি একক নহেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "আমার দেশ"ও বাঙ্গালীর সঙ্কল্প-প্রকাশক :—

বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ!
কেন গো মা, তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা, তোর
রুক্ষ কেশ?
কেন গো, মা, তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা, তোর
মলিন বেশ?

(কোরাস)

কিসের দুঃখ, কিসে দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ?
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে উচ্চে 'আমার দেশ।'

ইত্যাদি

ইহার শেষ ছত্র—

"দেবী আমার, সাধনা আমার, ধাত্রী আমার

—আমার দেশ

দেশ আমার—আমার আরাধ্যা দেবী, আমার জননী—আমার সাধনা—এই যে ভাব ইহাই বাঙ্গালার আন্দোলনের ভিত্তি। তাই বিপিনচন্দ্র পাল পরবর্ত্তী অসহযোগ আন্দোলনের সহিত এই আন্দোলনের তুলনা করিয়া বলিতেন— বাঙ্গালার আন্দোলন ভাবের আন্দোলন, পরবর্ত্তী আন্দোলন বণিকবৃত্তির আন্দোলন; প্রথম আন্দোলনে ভাবের প্রাধান্য, দ্বিতীয় আন্দোলন হিসাবের অপেক্ষা রাখিয়াছে।



বিপিনচন্দ্র পাল

বাস্তবিক উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের মতে, বাঙ্গালী ভাবের ঘরে চুরী করে নাই। তাই রজনীকান্ত সেন যে গাহিয়াছিলেন—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়

মাথায় তুলে নে রে, ভাই।"

সে জন্য বাঙ্গালীর ত্যাগ বড সাধারণ হয় নাই। বাঙ্গালা যেমন বিলাতী কাপড় বর্জ্জন-সঙ্কল্প করিল, বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালারা তেমনই

কাপড়ের মূল্য বাড়াইয়া সেই সুযোগে লাভবান হইতে লাগিলেন। তাঁহারা কাপড়ের মূল্য এত অধিক বাড়াইয়া দিলেন যে, তাঁহাদিগকে সঙ্গত লাভে সন্তুষ্ট থাকিতে অনুরোধ করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতারা উপেন্দ্রনাথ সেন ও সুরেন্দ্রনাথ মল্লিককে বোম্বাইয়ে পাঠাইলেন। তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা বলিলেন, বাঙ্গালা যদি ভাবাবেশে নির্ব্বোধের মত কায করে, তবে ব্যবসায়ীরা সেই সুযোগে লাভ করিতে বিরত হইবে কেন?

এই সময়—এই যুগ-সন্ধ্যায় জাতীয় দলের একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র 'সন্ধ্যা'। তাহার প্রবর্ত্তক—উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। ইনি এক জন অসাধারণ লোক। ইনি বাগ্মী কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র—নাম ভবানীচরণ। শুনিয়াছি, ইনিই বাঙ্গালী যুবকদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বলবানের ফুটবল খেলা "রাগবী" প্রবর্ত্তন করেন। যৌবনে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করিয়া ইনি সন্ন্যাসীর আচরণ করিতেন। ইনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ক্রমে হিন্দুধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া শেষে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় হিন্দুসমাজে আশ্রয় লইয়াছিলেন। 'সন্ধ্যায়' প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে ইনি আত্মপক্ষ সমর্থন করা ত পরের কথা—আদালতে জবাব দাখিল করিয়াছিলেন—তিনি "not responsible to an alien Government for his humble share in the God-ordained mission of Swaraj," মামলা শেষ হইবার পূর্ব্বেই উপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হয়। তিনি সর্ব্বজনবোধ্য ভাষায় জাতীয় ভাব প্রচার করিতেন।

বাঙ্গালায় যখন এই বিক্ষোভ, সেই সময় বারাণসীতে কংগ্রেসের অধিবেশন। সভাপতি—গোপালকৃষ্ণ গোখলে; অভ্যর্থনা সমিতির—সভাপতি মুন্সী মাধোলাল; প্রতিনিধি-সংখ্যা—৭ শত ৫৮। সভাপতি বাঙ্গালার আন্দোলন উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; পরন্তু তাহাকে জাতীয় জাগরণ বলিয়া

অভিহিত করিলেন। কিন্তু তিনি "স্বদেশীর" সমর্থন করিলেও "বয়কট" সমর্থন করিতে পারিলেন না। "বয়কট" কথার সহিত যে প্রতিহিংসা-স্মৃতি বিজড়িত, তাহা বিবেচনা করিয়া ভারতবাসীর পক্ষে তাহা অস্ত্ররূপে ব্যবহার সঙ্গত কি না, তিনি সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশও করিলেন। কথাটির উদ্ভব আয়ার্লণ্ডে। জমীদার কোন প্রজার জমী বিক্রয় করাইলে যদি আর কোন প্রজা তাহা ক্রয় করে, তবে তাহাকে বর্জ্জন করাই সঙ্গত—এই উপদেশ আইরিশ নেতা পার্ণেল দেন। এই উপদেশানুসারে প্রজারা এক জন জমীদারের কর্ম্মচারী ক্যাপ্টেন বয়কটকে "একঘরে" করে। প্রজাদিগের অনুরোধে ও ভয়ে তাঁহার ভৃত্য ও শ্রমিকরাও তাঁহাকে ত্যাগ করে। কেহ তাঁহার ক্ষেত্রে কায করে না, তাঁহার যান চালায় না, তাঁহার ঘোড়ার নাল বাঁধে না, তাঁহার কাপড় কাচে না, তাঁহার নিকট কোন জিনিষ বিক্রয় করে না। কামান লইয়া সৈনিকরা আসিয়া কতকগুলি লোক আনিয়া তাঁহার ক্ষেত্রের ফসল সংগ্রহ করে, ৫ হাজার টাকার ফসলের জন্য মোট ব্যয় হয়—৫৭ হাজার টাকা। সেই সময় হইতে "বয়কট" কথাটি চলিত হয়।

সভাপতি বাঙ্গালায় গৃহীত "বয়কটের" সমর্থন না করায় কয় জন বাঙ্গালী প্রতিনিধি বিরক্ত হইয়া বলেন, বয়কট ন্যায়সঙ্গত রাজনীতিক আন্দোলন বলিয়া স্বীকার না করিলে তাঁহারা কংগ্রেসে সস্ত্রীক যুবরাজকে অভিনন্দিত করার প্রস্তাবে আপত্তি করিবেন। ইহাতে শেষে স্থির হইল, অভিনন্দন-প্রস্তাবের আলোচনাকালে আপত্তিকারী বাঙ্গালী প্রতিনিধিরা মণ্ডপে থাকিবেন না; আর কংগ্রেসে যে প্রস্তাব গৃহীত হইবে, তাহাতে বলা হইবে—শেষ প্রতিবাদ ও একমাত্র নিয়মসঙ্গত উপায় হিসাবে বাঙ্গালায় "বয়কট" গৃহীত হইয়াছে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার সময় বক্তৃতায় অত্যন্ত মৃদুভাব অবলম্বন

করিলেও উহার সমর্থনে লালা লজপত রায় বাঙ্গালীকে অভিনন্দিত করেন। তাঁহার বক্তৃতার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি।

এই অধিবেশনে বাঙ্গালার যে মনোভাব লক্ষিত হইল, তাহা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। কারণ, সরকার বিধিনিষেধের দ্বারা বাঙ্গালায় বঙ্গবিভাগ উপলক্ষ করিয়া প্রবর্ত্তিত আন্দোলন দলিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; লোকও স্থির করিল, তাহারা সরকারের চেষ্টা ব্যর্থ করিবে। এই সময় বাঙ্গালার রাজনীতিক্ষেত্রে আর এক জন নেতার আবির্ভাব হইল। যে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি এবং যিনি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব্বে 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিয়াছিলেন :—

"আমিও সেইরূপ হিন্দু-জাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি, আমি দেখিতেছি, আবার আমার সম্মুখে মহাবলপরাক্রান্ত হিন্দু-জাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীরকুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেব-বিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে; হিন্দু-জাতির কীর্ত্তি—হিন্দু-জাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে। এই আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণ করিয়া আমি অদ্য বক্তৃতা সমাপন করিতেছি।"

তাঁহার দৌহিত্র—বাল্যাবধি বিলাতে শিক্ষিত—অরবিন্দ ঘোষ বরোদায় শিক্ষকের কার্য্য করিতেছিলেন। তিনি সুবোধচন্দ্র মল্লিকের বন্ধু ছিলেন। বাঙ্গালা যখন জাতীয় ভাবের প্লাবনে পূর্ণ, সেই সময় তিনি বাঙ্গালায় আসিলেন। কেহ লক্ষ্য করে নাই, তাঁহার জন্য নেতার আসন রক্ষিত ছিল। তিনি সেই আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি নবগঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের কায করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষে

বাঙ্গালার যুগবাণী প্রচার-প্রয়োজনে যখন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের সহযোগে—হরিদাস হালদারের দুঃসাহসে ইংরাজী দৈনিক পত্র 'বন্দে মাতরম' প্রকাশিত হইল—তখন সুবোধ-চন্দ্র মল্লিক তাহাকে জাতীয়দলের মুখপত্র-রূপে গ্রহণ করিলে তাহার সম্পাদক-সঙ্ঘে যোগ দিলেন। 'বন্দে মাতরম' পত্রের প্রকৃত সম্পাদক কেহ ছিলেন না—তখন সম্পাদকের নাম প্রকাশ করিতেও হইত না। কিন্তু যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সম্পাদকীয় বিভাগের কার্য্য আবর্ত্তিত হয়,



উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব

তিনিই যদি সম্পাদক হয়েন, তবে অরবিন্দকে 'বন্দে মাতরমের' সম্পাদক বলা যায়। সম্পাদক-সঙ্ঘে ছিলেন—অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও বর্ত্তমান লেখক। অরবিন্দ বক্তা ছিলেন না—তিনি ছিলেন সাধক, ভাবুক, শিক্ষক, লেখক। 'বন্দে মাতরম' সমগ্র ভারতে নবভাব প্রচার করিতে লাগিল।

এই সময় পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানদিগের মধ্যে এক দল কুপরামর্শে চালিত হইয়া স্বদেশীর ও বঙ্গবিভাগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে উগ্র ভাবে দণ্ডায়মান হইল। হিন্দুরা কোথাও কোনরূপ উগ্রতা প্রকাশ না করিলেও যে তাহারা

উগ্র হইয়াছিল, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়, তাহারা স্বার্থের প্ররোচনায় ও কুপরামর্শদাতৃগণের উত্তেজনায় চালিত হইয়াছিল। বিলাতী পণ্য বর্জ্জনে তাহাদিগের কোন ক্ষতি ছিল না—পরন্তু, তাহাতে বহু মুসলমানের অন্ন-সংস্থান হইতেছিল। একটি হাঙ্গামায় এক জন মুসলমান বিচারকই রায়ে বলিয়াছিলেন—"(মুসলমানদিগের) হাঙ্গামা করিবার কোন উত্তেজক কারণ ছিল না।" হিন্দুদিগকে লাঞ্ছিত করাই দাঙ্গাকারীদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দুর দেবস্থান কলুষিত ও হিন্দুনারী হরণ হইতে লাগিল। পূর্ব্ববঙ্গে ঢোল সহরতে প্রচারিত হইতে লাগিল "সরকার হিন্দু-দিগকে লুট করিতে দিয়াছেন।" প্রচারিত হইতে লাগিল—"সরকার বাহাদুর ও ঢাকার নবাব হুকুম জারী করিয়াছেন, হিন্দুদিগের (গৃহাদি) লুট করিলে বা তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিলে শাস্তি হইবে না।" বলা বাহুল্য কোন কোন দুষ্টবুদ্ধি মুসলমানই এইরূপ প্রচার করিয়াছিল। কিন্তু পুলিস তাহাদিগের সম্বন্ধে আবশ্যক সতর্কতা কেন অবলম্বন করে নাই, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়। "লাল ইস্তাহার" প্রকাশ্য ভাবে মুসলমানদিগকে হিন্দুর প্রতি অত্যাচার করিতে উত্তেজিত করিতে থাকে। আমরা নিম্নে একখানি ইস্তাহার প্রদান করিতেছি :—

"এতদ্বারা সহরস্থ হিন্দু শালাদের জানান যাইতেছে যে, সাত দিনের মধ্যে শালাদের ঘর বাড়ী লুট করিব, হিন্দু কি করিতে পারে। শালারা মুষ্টিমেয় হিন্দু হইয়া সমুদ্রবৎ মোছলেমের সঙ্গে লড়িতে চাও, শালারা জানে না যে, আমাদের এক দিন না হইলে ছিকার উপর হাঁড়ি উঠে। আমরা মৎস্য মোলাইতেছি, আমরা দুগ্ধ মোলাইতেছি, আমরা তরকারী মোলাইতেছি, কোন্ জিনিষ আমরা মোলাইতেছি না, কোন্ শালা হিন্দু আমাদের দ্বারা প্রতিপালিত না হইতেছে, আমাদের নিকট জিনিষ না খরিদ করিয়া আমাদের দ্বারা কাজ না করাইয়া কোন্ শালা হিন্দু চলিতে পারে, শালারা যদি আমাদের নিকট কোন জিনিষ খরিদ কর, কি আমাদের দ্বারা কাজ করাও, তাহা হইলে

গরুর গোস্ত খাও। ভাই মোছলেমগণ, তোমরা নাপাক হিন্দুদের কোন প্রকার সংস্রব রাখিও না। হিন্দুকে মার, হিন্দুর গৃহ লুট কর। হিন্দুর আওরতকে নিকা কর। হিন্দুর ধর্ম্মমন্দির ভগ্ন কর, হিন্দুর দেবদেবী ভগ্ন কর, যে রকমে পার হিন্দুকে তাড়াও, তাহা না হইলে তোমাদের মঙ্গল নাই। ভাই সকল, সাত দিনের মধ্যে হিন্দুদের উচ্ছেদ করিয়া ব্যাঙ্ক লুঠিয়া টাকা সংগ্রহ কর, গবর্মেণ্টে কিছুই বলিবে না।

শালাদের বড় ভগ্নীপতি
পাবনাস্থ মোছলেমগণ।"

যাহারা এইরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারে, তাহাদিগের দ্বারা সমাজের ও সভ্যতার কিরূপ সর্ব্বনাশ সম্ভব হইতে পারে, তাহা অনুমেয়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি "লাল ইস্তাহার" জারি করিয়াছিল, পূর্ব্ববঙ্গের সরকার তাহাকে কেবল এক বৎসরের জন্য শান্তি-রক্ষা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন!

বাঙ্গালার মুসলমানদিগকে ইহার পরিণামফল বুঝাইবার জন্য নানা চেষ্টাও হইয়াছিল। একটি গানের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"কিবা হইল ওগো নানি!
বড় আশা দিছিল লাট বাহাদুর কৈরা মেহেরবাণী।
দারগগীরি চাকরী দিবে, সাথে বৈসা খানা খাইবে,
আর বিলাতি মেম সাদি দিবে, মুই দেখামু কেরদানী।

শেষে কিন্তু—

"হুজুরেতে আর্জ্জি দিলাম দারগগীরি না পাইলাম,
ওরে এত আশা কৈরা শেষে নছিবে সানকী ধোয়া পানি!"

"বন্দে মাতরম" গান নিষিদ্ধ হইল। স্থানে স্থানে পুলিসের সহিত লোকের সঙ্ঘর্ষও হইতে লাগিল। বরিশালে প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল,—সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করা হইল।

এইরূপ অবস্থায় কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন। কয় মাস পূর্ব্বে নবগঠিত স্বদেশমণ্ডলী শিবাজী উৎসবের ও তৎসহ স্বদেশী শিল্পের প্রদর্শণী স্থাপনের আয়োজন করেন। তাহার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি জাতীয় দলের নেতারা কলিকাতায় আগমন করেন এবং তদবধি জাতীয় দলের পক্ষ হইতে তিলক মহাশয়কে কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। আর মডারেটরা সে চেষ্টা ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিতে থাকেন—কারণ, তিলক মহাশয় রাজদ্রোহের জন্য দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

শেষে মডারেটদিগের চক্রান্তে দাদাভাই নৌরজী সভাপতিপদ গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে জাতীয় দল আর তাহাতে আপত্তি করিলেন না। দাদাভাই সভাপতির আসন হইতে ভারতের কাম্য কি তাহার পরিচয় দিলেন—

স্বরাজ বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন।

বিষয়-নির্দ্ধারণ সমিতিতে দুই দলে শক্তি পরীক্ষা-আরম্ভ হইল যাহাতে বয়কট প্রস্তাব গৃহীত না হয়, সে জন্য বোম্বাই হইতে ফিরোজশা মেটা, এবং মাদ্রাজ হইতে কৃষ্ণস্বামী আয়ার ও আনন্দ চালু বহু প্রতিনিধি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। মেটা প্রস্তাব করিলেন বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে নিম্নলিখিত অংশ যোগ করা হউক—"এ বিষয়ে অনুসন্ধান জন্য এক কমিটী গঠিত হউক।" সভাপতি যখন বলেন, প্রস্তাবটি গৃহীত হইল, তখন জাতীয় দল জানাইলেন—তাঁহারা পরদিন কংগ্রেসে সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবেন এবং শেষে, অধিবেশনে, এই অংশ বর্জ্জিত হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের আপত্তিতে বাঙ্গালার স্থরেন্দ্রনাথও সম্মত হইয়া বয়কট সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটি মৃদু করিতে সম্মত হইলে বিপিনচন্দ্র পাল এক সংশোধক প্রস্তাব করেন। সভাপতি তাহা অগ্রাহ্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া, অনুরুদ্ধ হইয়াও, ভোট গণিতে

অসম্মত হওয়ায় জাতীয় দলের বহু প্রতিনিধি বিষয়-নির্দ্ধারণ সমিতির অধিবেশন ত্যাগ করেন।

বয়কট সম্বন্ধীয় প্রস্তাব লইয়া দুই দলে প্রবল মতভেদ দেখা দেয়। শেষে জাতীয় দলের প্রস্তাবই গৃহীত হয়---

"যেহেতু দেশের শাসন ব্যাপারে দেশের লোকের প্রায় কোন অধিকার নাই এবং যেহেতু তাহাদিগের আবেদন যথোপযুক্তরূপে বিবেচিত হয় না— তজ্জন্য কংগ্রেসের মতে, বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদে প্রবর্ত্তিত বয়কট আন্দোলন ন্যায়সঙ্গত।"

এই প্রস্তাব অম্বিকাচরণ মজুমদার উপস্থাপিত করিলে অনুমোদক বিপিনচন্দ্র পাল জাতীয় দলের পক্ষ হইতে ইহার ব্যাখ্যা করেন—ইহা কেবল পণ্য-বর্জ্জনই নহে, পরন্তু অবৈতনিক পদ ও পূর্ব্ব বঙ্গে সরকারের সহিত সহযোগ বর্জ্জনও বটে। তিনি বলেন, ইহা—movement; ইহা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে ও প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে ব্যাপ্তিলাভ করিবে।

এই ব্যাখ্যায় আপত্তি করিবার জন্য মাদ্রাজ হইতে আগত গোবিন্দরাঘব আয়ার, বাঙ্গালার আশুতোষ চৌধুরী, যুক্ত-প্রদেশের মদনমোহন মালব্য ও বোম্বাইয়ের গোপালকৃষ্ণ গোখলে ৪ জনকে প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে দেওয়া হয়। তাঁহারা বলেন, বয়কট বাঙ্গালার অবস্থা-বৈশিষ্ট্যহেতু বাঙ্গালায় সঙ্গত হইলেও অন্যত্র নহে।

দুই দলে মতভেদ সুস্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ফিরোজশা মেটা প্রভৃতি ব্যর্থমনোরথ হইয়া পরবর্ত্তী অধিবেশনে আপনাদিগের মত প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন। গঙ্গাধর চিঠনবিশ পরবৎসর অধিবেশন নাগপুরে আহ্বান করেন।

বাঙ্গালায় জাতীয় ভাব সরকারের অবলম্বিত চণ্ডনীতির ফলে দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তাহা মহারাষ্ট্রে ও পঞ্জাবেও প্রদীপ্ত হইল।

সরকার সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মামলা করিতে লাগিলেন, সভাধিবেশন নিষিদ্ধ হইতে লাগিল এবং শেষে বিনা বিচারে লোককে নির্ব্বাসন করাও আরম্ভ হইল। বাঙ্গালায় পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানরা অকারণে হিন্দুদিগকে লাঞ্ছিত করিতে লাগিল। প্রথমে পঞ্জাবে লালা লজপত রায় ও সর্দ্দার অজিত সিংহ নির্ব্বাসিত হইলেন।



ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়

এই সময় বাঙ্গালায় জাতীয় দলের আর একখানি দৈনিকপত্র প্রকাশিত হইল—মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা 'নবশক্তি' প্রচার আরম্ভ করিলেন।

'সন্ধ্যা' ও 'বসুমতীর' কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। 'বসুমতী' প্রথমে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় পরিচালিত হইয়া এই সময় সুরেন্দ্রচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছিল। ইংরাজীতে 'বন্দে মাতরম' এই দলের মুখপত্র।

স্থানীয় দলাদলির ছল ধরিয়া ফিরোজশা মেটা অধিবেশন-স্থান নাগপুর হইতে সুরাটে পরিবর্ত্তিত করেন। কলিকাতার অধিবেশনে যে ফিরোজশার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি তাহাতে আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত মনে করিয়া শেষে আর অধিবেশনে যোগ দেন নাই। তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সুরাটে মডারেট-প্রাধান্যে তিনি জাতীয়দলকে পরাস্ত করিয়া যেরূপেই হউক—নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবেন। এপ্রিল মাসে সুরাটেই বোম্বাই প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল এবং তথায় তিনি নিজ প্রভাববলে বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব গৃহীত হইতে দেন নাই। ইহাতে যেমন তাঁহার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, তেমনই সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন-ব্যবস্থার কারণও অনুমান করিতে পারা যায়।



রাসবিহারী ঘোষ

মডারেটরা রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি মনোনীত করিলেন। রাসবিহারী বাবুর মত আইনজ্ঞ লোক তৎকালে বিরল ছিলেন। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি কখন কোনরূপ কৃতিত্ব-পরিচয় দেন নাই। ভারত সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় তিনি রাজদ্রোহজনক সভা-বিষয়ক আইনের

প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বভাবতঃ জনগণানুষ্ঠানবিমুখ ও মডারেট মনোভাব-সম্পন্ন ছিলেন। এ দিকে লালা লজপত রায় মুক্তিলাভ করিলেন। জাতীয় দল তাঁহাকেই সভাপতি করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কারণ, তাহাতে বিনাবিচারে লোককে নির্ব্বাসিত করার যেরূপ প্রতিবাদ হইবে, সেরূপ আর কিছুতেই হইতে পারে না। কিন্তু ফিরোজশা প্রমুখ মডারেটরা রাজরোষভাজন হইয়াছিলেন বলিয়া যেমন বালগঙ্গাধর তিলককে কংগ্রেসের সভাপতি হইতে দিতে চাহেন নাই, তেমনই লালাজীকে সভাপতি করিতে শঙ্কানুভব করিতেছিলেন। বাঙ্গালায়ও মডারেটা যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহাতে মেদিনীপুরে প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন হইতে জাতীয় দল চলিয়া আসিয়া স্বতন্ত্র সভা করেন।

এই অবস্থায় সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন। ইহাতে প্রতিনিধি-সংখ্যা —প্রায় ১৩ শত ; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—ত্রিভুবনদাস মালবী ; নির্ব্বাচিত সভাপতি—রাসবিহারী ঘোষ।

২৬শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের অধিবেশন হইবার কথা। তাহার পূর্ব্বে শুনা যায়, ফিরোজশা-শাসিত মডারেটরা এই অধিবেশনে কলিকাতার অধিবেশনে গৃহীত—স্বরাজ, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবগুলি বর্জ্জন করিবেন। জাতীয় দলের পক্ষ হইতে তিলক মহাশয় প্রস্তাবগুলির খশড়া পুনঃ পুনঃ চাহিয়াও পাইলেন না। তাহাতে সন্দেহ ঘনীভূত হইল। তিলক, মতিলাল ঘোষ, অরবিন্দ প্রভৃতি পরামর্শ করিয়া স্থির করেন—যদি পূর্ব্বাধিবেশনে গৃহীত জাতীয় ভাবের পরিপোষক প্রস্তাব-



অরবিন্দ ঘোষ

গুলি ত্যক্ত হয়, তবে তাঁহার সভাপতি-নির্ব্বাচন হইতেই প্রতিবাদ আরম্ভ করিবেন। লালা লজপত রায়ও মীমাংসার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইলেন এবং সুরেন্দ্রনাথও ফিরোজশার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারিলেন না। তিলক সুরেন্দ্রনাথকে জানাইলেন, নিম্নলিখিত সর্ত্তে তিনি সভাপতি-নির্ব্বাচনে আপত্তি প্রকাশে বিরত হইতে পারেন :—

(১) জাতীয় দলের নিকট প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইবে যে, পূর্ব্বাধিবেশনে গৃহীত কোন প্রস্তাব ত্যক্ত হইবে না ; এবং

(২) সভাপতি-নির্ব্বাচনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার সময় বলিতে হইবে যে, জনসাধারণ লালাজীকে সভাপতি করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ বলেন, দ্বিতীয় বিষয়টির উল্লেখ তিনিই সভাপতি-নির্ব্বাচন-কালে বলিবেন। তিনি দ্বিতীয় বিষয় সম্বন্ধে বলেন—বাঙ্গালার প্রতিনিধিরা ইহাতে সম্মত আছেন ; কিন্তু তিলক এ বিষয়ে গোপালকৃষ্ণ গোখলে বা ত্রিভুবনদাস মালবীর সহিত সাক্ষাৎ করুন। ত্রিভুবনদাসকে সুরেন্দ্রনাথের বাসায় আনিতে লোক পাঠান হইল বটে, কিন্তু তিনি আসিলেন না। পরে তিলক মণ্ডপে ত্রিভুবনদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন—সভাপতির শোভাযাত্রায় আর বিলম্ব নাই ; সুতরাং তিনি তিলকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না! তখনও জাতীয় দলকে কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলির খশড়া দেওয়া হইল না। এই উদ্ধত ও অশিষ্ট ব্যবহারের পর প্রকাশ্য অধিবেশনে মডারেটদিগের কার্য্যের প্রতিবাদ করা ব্যতীত জাতীয় দলের আর কোন পথ রহিল না এবং তিলক সুরেন্দ্রনাথকে জানাইয়া দিলেন তাঁহাকে আর পূর্ব্বব্যবস্থানুসারে বলিতে হইবে না যে, লোক লালা লজপত রায়কে সভাপতি করিতে চাহিয়াছিলেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে দেওয়ান বাহাদুর অম্বালাল সাকেরলাল দেশাই প্রস্তাব করিলেন--রাসবিহারী ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করুন। তাহাতে আপত্তিজনক ধ্বনি শ্রুত হইল। সুরেন্দ্র

নাথ যখন সেই প্রস্তাব সমর্থন করিতে উঠিলেন, তখন চারিদিক হইতে আপত্তিব্যঞ্জক ধ্বনি এত প্রবল হইল যে, কম্বুকণ্ঠ সুরেন্দ্রনাথের কথাও আর শুনা গেল না এবং অধিবেশন স্থগিদ রাখিতে হইল। এ দিকে সেই দিন অপরাহ্নে সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' পত্রের অতিরিক্ত সংখ্যায় রাসবিহারী বাবুর



গিরিশচন্দ্র ঘোষ

অপঠিত অভিভাষণ—পঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইল এবং তাহা কলিকাতা হইতে তারে সুরাটে পৌছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রবর্ত্তিত 'বেঙ্গলী' সুরেন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই

অভিভাষণে জাতীয় দলের প্রতি আক্রমণ ছিল। তাহা যেন অগ্নিতে ইন্ধন যোগ করিল।

পরদিন অধিবেশনের পূর্ব্বে বালগঙ্গাধর তিলক অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিকে লিখিলেন :—

মহাশয়,

আপনার নির্ব্বাচন-প্রস্তাব সমর্থিত হইবার পর আমি প্রতিনিধিদিগকে কিছু বলিতে চাহি। কোন বিশেষ সংগঠন প্রস্তাবের জন্য কিছু সময় পাইবার আশায় আমি এই প্রস্তাব করিব। অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহা সভায় জ্ঞাপন করিবেন।

ভবদীয়

বালগঙ্গাধর তিলক।

অধিবেশনারম্ভে সুরেন্দ্রনাথ সভাপতি নির্ব্বাচন-প্রস্তাব সমর্থন করিলে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তাহার অনুমোদন করিবার পরই তিলক মঞ্চে উঠিবার উদ্যোগ করিলেন। ফিরোজশা মণ্ডপে কতকগুলি মুসলমান গুণ্ডা আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। এক জন স্বেচ্ছাসেবক তিলককে বাধা দিলে তিনি তাহাকে সরাইয়া দিয়া মঞ্চের উপর দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। মঞ্চের উপর মডারেটরা তিলককে বাধা দিতে লাগিলেন এবং রাসবিহারী বাবু অভিভাষণ পাঠের চেষ্টা করিতে লাগিলেন—মণ্ডপমধ্যে উত্তেজনার উদ্ভব হইল। কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক এক যুবক তিলককে নামাইয়া দিবার জন্য তাঁহার গাত্রে হস্তার্পণ করিলে তিলক বলিলেন, তাঁহাকে বলপূর্ব্বক অপসারিত না করিলে তিনি যাইবেন না। তিলক বিক্ষুব্ধ জনতার সম্মুখে—বিপক্ষদলের মধ্যে নির্ভীকভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কুরুপিতামহ অস্ত্রত্যাগ করিয়া যে ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া শরাঘাত সহ্য করিয়াছিলেন, তিলক সেইভাবে ব্যবহার করিলেন। এই সময় মণ্ডপমধ্য হইতে নিক্ষিপ্ত একখানি

পাদুকা সুরেন্দ্রনাথের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ফিরোজশার গণ্ডে আঘাত করিল। অনেকের বিশ্বাস, উহা তিলকের উদ্দেশেই নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

বিক্ষোভ নিবারণ করা অসম্ভব হইল—অধিবেশন বন্ধ হইয়া গেল।

যাহাতে মীমাংসার পর আবার কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, সেই জন্য মতিলাল ঘোষ প্রমুখ বাঙ্গালার কয়জন প্রতিনিধি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিলক লিখিয়া দিলেন ঃ—

আমাদিগের কথা ও আলোচনার ফলে কংগ্রেসের হিতার্থ আমি জানাইতেছি যে, আমি বা আমার দল ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির ত্রয়োবিংশ অধিবেশনে ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করায় কোনরূপ আপত্তি করিব না। কিন্তু গত অধিবেশনে গৃহীত, স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবগুলি এ বৎসরও গ্রহণ করিতে হইবে এবং ডাক্তার ঘোষের অভিভাষণে যদি জাতীয়দলের নেতৃবৃন্দ ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন এমন কোন উক্তি থাকে, তবে সে সব বর্জ্জন করিতে হইবে।

এই পত্র লইয়া মতি বাবু প্রভৃতি মডারেটদিগের সহিত মীমাংসার প্রস্তাব করিলেন। মডারেটরা তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া সে বারের মত কংগ্রেসের অধিবেশন বন্ধ রাখিলেন।

জাতীয় দলের পক্ষ হইতে যে বিবৃতি প্রকাশিত হয়, তাহাতে দেখা যায়, মডারেটরা কলিকাতায় গৃহীত প্রস্তাবগুলিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া সে সকলের স্বরূপ ক্ষুণ্ণ করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। বিবৃতির পরিশিষ্টে তাহা বিস্তৃতভাবে দেখান হয়। ভারত-সচিব লর্ড মর্লি তখন বলিয়াছেন, ভারতে মডারেটদিগকে সরকারের পক্ষে লইবার (to rally the Moderates to the cause of the Government) যথাসাধ্য চেষ্টা না করিলে সরকার ভুল করিবেন। তিনি আরও কিছু আশা দিয়াছিলেন। বোধ হয়, মডারেটরা তাহাতেই আকৃষ্ট হইয়া জাতীয়তার

মর্য্যাদা রক্ষায় অনবহিত হইয়াছিলেন। নহিলে তাঁহাদিগের পক্ষে কলিকাতার অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির বর্জ্জন বা পরিবর্ত্তন-সঙ্কল্পের কারণ বুঝা যায় না।

এক দিকে শঙ্কাকম্পিত মডারেটদল—আর এক দিকে জাতীয় দলের নূতন উদ্যম ও উৎসাহ; এক দিকে ফিরোজশা মেটা প্রমুখ দাম্ভিক নেতৃগণের স্বৈরাচার,—আর এক দিকে গণতন্ত্রের নীতি-সজ্ঘর্ষে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গেল। কোন্ পক্ষে ন্যায় ছিল, তাহা কাল বুঝাইয়াছে।

২৭শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে ফিরোজশার আবাসে মডারেটরা সম্মিলিত হইলেন এবং পরদিন এক সভা আহ্বান করিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক পত্র প্রচার করিলেন :—

"বিশেষ বেদনাদায়ক ব্যাপারে কংগ্রেসের ত্রয়োবিংশ অধিবেশন বন্ধ হওয়ায় আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীরা ভবিষ্যতে দেশে রাজনীতিক অনুষ্ঠান সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনের (ব্যবস্থার) জন্য এক সভা আহ্বান করিতেছি। কংগ্রেসের যে সকল প্রতিনিধি নিম্নলিখিত বিষয়ে একমত, তাঁহারাই এই সভায় যোগ দিতে পারিবেন :—

"(১) ভারতের পক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বায়ত্ত-শাসনশীল অংশের স্বায়ত্ত-শাসনের মত শাসন লাভ এবং সেই সব অংশের লোকের সহিত তুল্যভাবে অধিকার ও দায়িত্ব সম্ভোগ আমাদিগের রাজনীতিক আদর্শ।

"(২) এই আদর্শের দিকে অগ্রসর হওয়া সর্ব্বতোভাবে আইনসঙ্গত উপায়ে, বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতির সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়া, জাতীয় ঐক্য পুষ্ট করিয়া ও দেশের জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া—সম্পন্ন হইবে।

"(৩) এই সব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে সব সভাদি হইবে, সে সকলে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইবে এবং কার্য্য-পরিচালন-ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের নির্দ্দেশানুসারে চালিত হইতে হইবে।

"কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্যকরী সমিতি কর্ত্তৃক ব্যবহারার্থ প্রদত্ত মণ্ডপে ইঁহারা ২৮শে ডিসেম্বর শনিবার বেলা ১টায় সমবেত হইবেন।"

ইহাতে রাসবিহারী ঘোষ, ফিরোজশা মেটা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, দীনশা ইদালজী ওয়াচা, নরেন্দ্রনাথ সেন, অম্বালাল সাকেরলাল দেশাই, কৃষ্ণস্বামী আয়ার, ত্রিভুবনদাস মালবী, মদনমোহন মালব্য, চিমনলাল শীতলবাদ, অম্বিকাচরণ মজুমদার, আশুতোষ চৌধুরী' গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা, তেজবাহাদুর সপরু প্রভৃতির স্বাক্ষর ছিল।

এই পরামর্শ সভায় স্থির হয়—প্রায় এক শত লোক লইয়া কংগ্রেসের নিয়ম-রচনা সমিতি গঠিত হইবে।

এই সমিতি যে সব নিয়ম করেন, সে সকলে জাতীয় দলের আপত্তির কারণ—কংগ্রেস ব্যতীত কেহ নিয়ম রচনা করিয়া কংগ্রেসকে বাধ্য করিতে পারেন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মডারেট-প্রাধান্য

—০—

মডারেটরা কোন্ অধিকারে কংগ্রেস অধিকার করেন, তাহা বলা যায় না। তবে ইংরাজ রাজপুরুষরা যে তাঁহাদিগের সহায় ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মাডারেটরা কংগ্রেসের যে উদ্দেশ্য বিবৃত করেন তাহা এইরূপ :—

বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বায়ত্ত-শাসনশীল দেশগুলিতে যেরূপ শাসন-পদ্ধতি আছে, সেইরূপ শাসন-পদ্ধতি লাভ ও সাম্রাজ্যের ব্যাপারে সেই সব দেশের লোকের মত দায়িত্ব সম্ভোগের উদ্দেশ্যে এই জাতীয় মহাসমিতি গঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতি ধীর অথচ অপ্রতিহতভাবে সংস্কৃত করিয়া আইন-সঙ্গত উপায়ে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে। জাতীয় ঐক্যবৃদ্ধি, জাতীয় ভাবের উদ্বোধন, দেশের লোকের মানসিক, নৈতিক, আর্থিক ও বাণিজ্যগত উন্নতি সাধন করাও এই মহাসমিতির উদ্দেশ্য।

এই নিয়ম পালনের অঙ্গীকার ব্যতীত কাহারও কংগ্রেসে যোগদানের অধিকার অস্বীকৃত হয়।

বলা বাহুল্য, সভাসমিতির প্রচলিত নিয়মানুসারে এইরূপ ব্যবস্থা করিবার অধিকার কোন দলের থাকিতে পারে না।

জাতীয় দল সুরাটের ব্যাপারের পর লোকমত গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া নিয়মানুগভাবে কংগ্রেসে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ও স্বৈরাচার নিবারণের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। বাঙ্গালায় ও মহারাষ্ট্রে এই কার্য্য যেরূপ অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহাতে মডারেটরা শঙ্কানুভব করিলেন। অর্দ্ধোদয় যোগে কলিকাতায় স্বেচ্ছাসেবকরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কায করিবার যে যোগ্যতা-পরিচয়

প্রদান করিল, তাহাতে পুলিসও তাহাদিগের প্রশংসা না করিয়া পারিল না।

বাঙ্গালায় একাধিক সংবাদপত্রের পরিচালকদিগের বিরুদ্ধে মামলা উপস্থাপিত করা হইল।

এই সময় পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন হইল। তাহাতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—আশুতোষ চৌধুরী; সভাপতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইহাতেও জাতীয় দলের মত প্রতিষ্ঠিত হয়।



আশুতোষ চৌধুরী

'বন্দে মাতরম' পত্রের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত মামলায় সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিয়া বিপিনচন্দ্র পাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ৯ই মার্চ্চ তিনি মুক্তিলাভ করিলেন, বিপুল আগ্রহে লোক তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং তিনি নবোদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

১লা মে সংবাদ পাওয়া গেল, পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার পর মজঃফরপুরে বোমানিক্ষেপ-ফলে ২ জন রমণীর মৃত্যু হইয়াছে। অনুমান—বোমা 'বন্দে মাতরম,' 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি' পত্রের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত মামলার বিচারক মিষ্টার কিংসফোর্ডের জন্য উদ্দিষ্ট ছিল—ভুল হওয়ায় অন্য যানে নিক্ষিপ্ত হয়। পরদিন মাণিকতলায় একটি বাগানে বোমার সরঞ্জাম সহ হেমচন্দ্র দাস, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয় জন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। অরবিন্দও গ্রেপ্তার হয়েন। বিচারে দীর্ঘদিন পরে অরবিন্দ মুক্তিলাভ করেন—যুবকরা নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হয়। যখন বিচার চলিতেছিল, সেই সময় জেলের মধ্যে স্বীকারোক্তিকারী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী—কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক নিহত হয়।

বাঙ্গালায় একাধিক মামলায় লোক অভিযুক্ত হইলে—পুলিসের সাজান সাক্ষ্য মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। ওদিকে 'কেশরী' পত্রে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের জন্য অভিযুক্ত হইয়া তিলক ৬ বৎসরের জন্য দেশান্তর ও এক হাজার টাকা জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। জুরী তাঁহাকে অপরাধী বলিলে তিনি বলিলেন :—

'জুরী যাহাই কেন বলুন না, আমি বলি—আমি নিরপরাধ। কোন বৃহত্তর শক্তির দ্বারা আমাদিগের নিয়তি নিয়ন্ত্রিত হয়। হয়ত ইহাই ভগবানের অভিপ্রেত যে, আমি যে কার্য্যের সমর্থন করি ও আমি যাহার প্রতিনিধি আমি স্বাধীন থাকা অপেক্ষা আমার লাঞ্ছনায় তাহার অধিক উন্নতি হইবে।"

সভাধিবেশন সম্বন্ধে অধিকার-সঙ্কোচক ব্যবস্থা হইল এবং নানা সংবাদ-পত্রের কার্য্যালয়ে খানাতাল্লাস হইতে লাগিল। পুলিস কমিশনার যখন 'বন্দে মাতরম' পত্রের উপর ইস্তাহার জারি করিলেন—জেলে নরেন্দ্রনাথ

গোস্বামীর হত্যা সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধের জন্য কেন ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত হইবে না, ৩০শে অক্টোবর তাহার কারণ দর্শাইতে হইবে—তখন 'বন্দে মাতরম' পত্র বন্ধ করা হইল।

৬ই নভেম্বর কলিকাতায় 'অমৃত বাজার পত্রিকা' কার্য্যালয়ে এক পরামর্শ সভা হইল। তাহাতে যোগ দিবার জন্য নাগপুর হইতে জাতীয় দলের বহু প্রতিনিধি আসিলেন। সভায় স্থির হইল, মডারেটরা যে সব নিয়ম রচনা করিয়াছেন, সে সব কংগ্রেসকৃত নহে বলিয়া কংগ্রেস সে সব মানিয়া লইতে পারেন না। সে সভায় মডারেটদিগের পক্ষে ভূপেন্দ্রনাথ বসু উপস্থিত হইয়া বলিলেন—মডারেটদিগের কনভেনসন যে কংগ্রেসের ক্ষমতা অযথা-রূপে আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু মিলন করিতে হইলে সে সব আপাততঃ গ্রহণ করিতে হয়। তিনি বলেন, সুরেন্দ্রনাথ ও তিনি এই ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। জাতীয় দল যদি এখন "ক্রীড" বা উদ্দেশ্যবিবৃতি গ্রহণ করেন, তবে বাঙ্গালার মডারেটরা কলিকাতার অধিবেশনে গৃহীত স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবগুলি কংগ্রেসে গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করিবেন। শেষে ফিরোজশার আপত্তিতে ইহাও হয় নাই। সে দিন যদি বাঙ্গালার মডারেট নেতারা ফিরোজশার অন্যায় সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন, তবে কংগ্রেসের ইতিহাস অন্যরূপ হইত।


অশ্বিনীকুমার দত্ত

১১ই ডিসেম্বর ও তাহার পরদিন শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রভৃতি ৭ জনকে বিনাবিচারে নির্ব্বাসিত করা হইল।

জাতীয় দল নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনের চেষ্টা করিতেছিলেন। সরকার ঘোষণা করিলেন—তথায় অধিবেশন হইতে দিবেন না।

১৭ই ডিসেম্বর যখন মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার-ব্যবস্থা প্রকাশিত হইল, তখন লোক তাহাতে সন্তোষ লাভ করিতে পারিল না। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার রিপোর্টেও তাহার প্রকৃতিগত দৈন্য স্বীকৃত হইয়াছিল।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে কনভেনসন কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এ বার প্রতিনিধি-সংখ্যা—৬শত ২৬; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—দেওয়ান বাহাদুর কৃষ্ণস্বামী রাও; সভাপতি—রাসবিহারী ঘোষ।

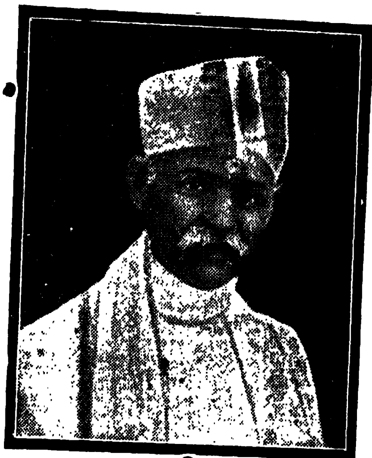

মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা

সভাপতির অভিভাষণে চণ্ড-নীতিদ্যোতক আইনের নিন্দা করিয়া বলা হয়, সে সব ব্যবস্থায় লোকের মনে আর আশার অবকাশ থাকে না। শেষে তিনি বলেন—"ইহার পর যুবকরা আমাদিগের এই কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। আশা করি, তাঁহাদিগের পূর্ব্বে যাহারা তাঁহাদিগের কায করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের কার্য্যে ত্রুটি থাকিলেও তাঁহারা (যুবকরা) তাঁহাদিগের প্রতি সদয় হইবেন।" কিন্তু শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন, তাহা জাতীয়তার পরিপোষক নহে। তিনি বলেন, উহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও ভারতবাসী কৃতজ্ঞতা সহকারে উহা গ্রহণ করিবে।

সৈয়দ হাসাম ইমাম ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু বিনাবিচারে লোককে দণ্ড দানের তীব্র প্রতিবাদ করেন।

পরবৎসরের অধিবেশন লাহোরে। এবার প্রতিনিধি-সংখ্যা—মাত্র ২ শত ৪৩; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—লালা হরকিষণ লাল; সভাপতি—পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। ফিরোজশা মেটারই সভাপতি হইবার কথা ছিল; কিন্তু অধিবেশনের মাত্র ৬ দিন পূর্ব্বে তিনি অস্বীকৃতি জানাইলে পণ্ডিত মদনমোহনকে সভাপতি করা হয়।

তখন লর্ড মর্লির শাসন-সংস্কার ব্যবস্থায় সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বড়লাটের শাসন-পরিষদের অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হওয়ায় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করা হয়। মদনমোহন শাসন-সংস্কার ব্যবস্থার নানা ত্রুটির উল্লেখ করেন এবং সে বিষয়ে একটি প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছিল। সৈয়দ হাসান ইমাম সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনাধিকারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। এই অধিবেশনে বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদ-প্রস্তাবে ভূপেন্দ্রনাথ বসু বলেন—"যতদিন বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব থাকিবে, যতদিন বাঙ্গালীর শিরায় রক্ত প্রবাহিত থাকিবে, যতদিন সম্মিলিত ভারতের আদর্শ আমাদিগের দৃষ্টিতে থাকিবে, যতদিন বাঙ্গালার নদীগুলি সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইবে, যতদিন বাঙ্গালার শস্য-ক্ষেত্রে জননীর শ্যামল অঞ্চল বিলুণ্ঠিত হইবে, ততদিন আমরা বঙ্গবিভাগের



পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

প্রতিবাদে বিরত হইব না। যতদিন 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে বাঙ্গালী নবজীবনে সঞ্জীবিত হইবে, ততদিন আমরা প্রতিবাদ করিতে থাকিব।'

এই সময় বাঙ্গালা ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশের প্রধান মডারেটরা, বোধ হয়, সরকারের অপ্রীতি অর্জ্জনের ভয়ে ও প্রীতি অর্জ্জনের আশায়, সরকারের সব ব্যবস্থার সমর্থন করিতে থাকেন। এমন কি গোপালকৃষ্ণ গোখলে এমন মতও ব্যক্ত করিতে লজ্জানুভব করেন না যে, ভারতবাসী বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বায়ত্ত-শাসনাধীন স্থানসমূহের মত শাসন-পদ্ধতি পাইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে নাই!

১৯১০ খৃষ্টাব্দের অধিবেশনের স্থান—এলাহাবাদ; প্রতিনিধি-সংখ্যা—৬৩৪; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—সুন্দরলাল; সভাপতি সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ। সভাপতি য়ুরোপীয় রাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত ভারতবাসীদিগের, হিন্দুদিগের সহিত মুসলমানদিগের ও মডারেটদিগের সহিত জাতীয় দলের ভেদের বিশেষ আলোচনা করেন এবং স্বীকার করেন, ভারতবাসীর আত্মশক্তিতে প্রত্যয়হেতু ভারতে নবভাবের উদ্ভব হইয়াছে। তখন কংগ্রেস কি অবস্থায় উপনীত হইয়াছে—একটি ব্যাপারের উল্লেখ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে—এই অধিবেশনে নূতন বড় লাট লর্ড হার্ডিংকে অভিনন্দন পত্র প্রদানের ব্যবস্থা হয়।

মহম্মদ আলি জিনা, মজরল হক, ও সৈয়দ হাসান ইমাম ব্যবস্থাপক সভা ব্যতীত অন্যান্য (স্থানীয়) প্রতিষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক হিসাবে প্রতিনিধি প্রেরণ ব্যবস্থার নিন্দা করেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন কলিকাতায় (গ্রীয়ার পার্কে)। ইহাতে প্রতিনিধি-সংখ্যা ৪ শত ৪৬; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—ভূপেন্দ্রনাথ বসু; সভাপতি—পণ্ডিত বিষণনারায়ণ দার। এই অধিবেশনে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডকেই সভাপতি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল; তাঁহার পত্নী-

বিয়োগ হেতু তিনি সে পদ গ্রহণ করেন নাই। এই অধিবেশনের পূর্ব্বেই সম্রাটের ঘোষণায় বঙ্গবিভাগ-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল—পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ সম্মিলিত হইয়া বাঙ্গালা প্রদেশে পরিণত হয়; বিহার ও উড়িষ্যা এবং আসাম বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়। সভাপতি বলেন, এ দেশে আমলাতন্ত্র দেশবাসীর আশার ও আকাঙ্ক্ষার বিরোধী। রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর রাজদ্রোহজনক সভাবিষয়ক আইনের, ছাপাখানা আইনের ও বিনাবিচারে নির্ব্বাসন-ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন।



বিষণনারায়ণ দার

১৯১২ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন—বাঁকিপুরে। ইহাতে প্রতিনিধি-সংখ্যা মাত্র ২ শত ৭; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—[সৈয়দ হাসন ইমাম হাই কোর্টের জজ নিযুক্ত হওয়ায়] মজরল হক; সভাপতি—আর, এন, মুধলকার।

এই অধিবেশনের পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি বিষয় উল্লেখযোগ্য—[১] কলিকাতা হইতে দিল্লীতে রাজধানী পরিবর্ত্তন ব্যবস্থার বিবৃতিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের যে কথা ছিল, ভারত-সচিব লর্ড ক্রু পার্লামেণ্টে তাহার সম্বন্ধে বলেন—ভারতবাসীরা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভের আশা করিতে

পারেন না। [২] লর্ড হার্ডিং যখন শোভাযাত্রা করিয়া দিল্লীতে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন তিনি বোমায় আহত হয়েন।


আর, এন, মুধলকার

সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে বলেন, ভারতবাসীরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানের প্রজার তুল্যাধিকার চাহেন। তিনি শাসন-সংস্কার আইনের বলে গঠিত নিয়মগুলির ত্রুটি দেখান।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই অধিবেশনে অম্বিকাচরণ মজুমদার বলেন, স্বদেশীর উদ্ভব প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিতে ও প্রতিশোধ লইবার সঙ্কল্পে! অথচ স্বদেশী যে অর্থনীতিক প্রয়োজনে প্রবর্ত্তিত তাহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন—করাচীতে। এ বার প্রতিনিধি সংখ্যা—৫৫০; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—হরচন্দ্র বিষণদাস; সভাপতি—নবাব সৈয়দ মহাম্মদ।

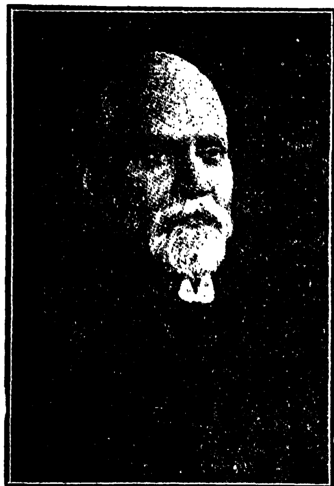
মসলেম লীগ যে স্বায়ত্ত-শাসনের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া ভূপেন্দ্রনাথ বসু বলেন, যদি এ দেশে হিন্দু মুসলমানে মিলন হয়, তবে ভবিষ্যতে যে শক্তিশালী, বৃহৎ মহাভারতের উদ্ভব হইবে, তাহা অশোকের সাম্রাজ্যকে ও আকবরের কল্পিত সাম্রাজ্যকে পরাভূত করিবে। মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক আইনের প্রতিবাদ-প্রসঙ্গে তিনি বলেন—বিদেশী সরকারের হস্তে এই অস্ত্রে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা বিদ্যমান—"that law is a source of great peril."



সৈয়দ মহাম্মদ

ইহার পরবর্ত্তী অধিবেশনের স্থান—মান্দ্রাজ। ইহাতে প্রতিনিধি-সংখ্যা—৮ শত ৬৬; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—সার সুব্রহ্মণ্য আয়ার; সভাপতি—ভূপেন্দ্রনাথ বসু।

এই অধিবেশনের পূর্ব্বেই জার্ম্মাণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ভূপেন্দ্রনাথের অভিভাষণে জাতীয় ভাবের বিকাশ ছিল। কিন্তু দুই কারণে তিনি বিশেষ ধীর ও সতর্কভাবে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন :—(১) জার্ম্মাণযুদ্ধে ইংলণ্ড তখন বিপন্ন, (২) তিনি ও তাঁহার মত মডারেটরা তখন কংগ্রেসের দৌর্ব্বল্য অনুভব করিয়া দুই দলে মিলন-সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার অভিভাষণে যে অনেকে হতাশ হইবেন, তাহা তিনিই বলেন। তিনি বলেন—কংগ্রেস সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিসভা ; আর ভারতবর্ষ কখন চিরকাল নাবালক থাকিতে পারে না।



ভূপেন্দ্রনাথ বসু

ভূপেন্দ্রনাথের এই বক্তৃতা রাজনীতিকোচিত হইয়াছিল।

কিন্তু কংগ্রেসে মডারেট মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ব্যবস্থা হইয়াছিল, কংগ্রেসে রাজভক্তিজ্ঞাপক এক প্রস্তাব গৃহীত হইবে এবং যে সময় সেই প্রস্তাব আলোচিত হইবে, সেই সময় মাদ্রাজের গভর্ণর মণ্ডপে প্রবেশ করিবেন। তাঁহার আগমন-বিলম্বে যখন আর একটি প্রস্তাব আলোচিত হইতেছিল, তখন তিনি উপস্থিত হইলে সেই অসমাপ্ত আলোচনা বন্ধ রাখিয়া ব্যবস্থানুসারে রাজভক্তিজ্ঞাপক প্রস্তাবের আলোচনা আরম্ভ হয়! গভর্ণর মণ্ডপ পরিত্যাগ করিবার পর আবার পূর্ব্বের প্রস্তাবটির আলোচনার ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থি দেওয়া হয়।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন বোম্বাই সহরে। ইহাতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—সার দীনশা ওয়াচা; সভাপতি—সার (পরে লর্ড) সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ। ইনি পূর্ব্বে কখনও সক্রিয়ভাবে রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দেন নাই। তবে ইনিই বড় লাটের শাসন পরিষদে প্রথম ভারতীয় সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার সভাপতি নির্ব্বাচনে অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি বড় ব্যারিষ্টার ছিলেন। ব্যারিষ্টারদিগের মধ্যে তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ লোকের অভাবও ছিল না। তাঁহাদিগের মধ্যে মিষ্টার নর্টন বলেন—তাঁহার নির্ব্বাচনে কংগ্রেস নির্ব্বাপিত হয়।



সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

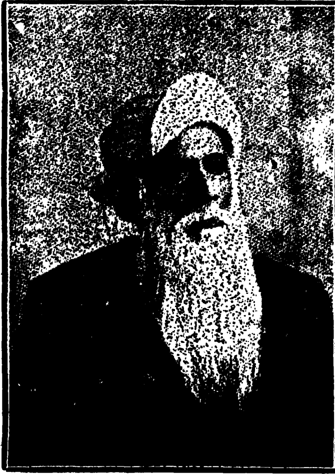
আজ এ কথা বলিতে পারি, এই নির্ব্বাচনের মূলে ছিলেন—ভূপেন্দ্রনাথ বসু। যুদ্ধকালে তাঁহার মত লোকের দ্বারা ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করাই তিনি রাজনীতিকোচিত মনে করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্নকে বড় লাটের শাসন পরিষদে সদস্যপদ গ্রহণ করাইতে যেমন, কংগ্রেসের সভাপতিপদ গ্রহণ করাইতেও তেমনই এবং শেষে বিলাতের অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে সম্মত করাইতেও তেমনই ভূপেন্দ্রনাথই তাঁহাকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। তাঁহার শান্তি পরিষদে প্রতিনিধি নিয়োগও যে ভূপেন্দ্রনাথের কায তাহা, বোধ হয়, বর্ত্তমান লেখক ব্যতীত আর কেহই জানেন নাই।

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বলেন, স্বায়ত্ত-শাসনই আমাদিগের কাম্য বটে, কিন্তু তাহা প্রবর্ত্তনের সময় এখনও হয় নাই। তবে তিনি বলেন:—

"স্বদেশ রক্ষার দায়িত্ব লাভ ব্যতীত লোকের মনে নাগরিকের মনোভাব প্রস্ফুরিত হইতে পারে না। যদি দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়, তবে অপরে সে সব দলিত করিবে ; যদি দেশের বিপদ ঘটে, তবে অন্য লোক দেশ রক্ষা করিবে—যখন জাতির মনোভাব এইরূপ হয়, তখন বুঝা যায়, জাতির হৃদয় হইতে নাগরিকের দায়িত্ববোধ বিলুপ্ত হইয়াছে। যে শাসন-পদ্ধতিতে জাতির এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটে, সে শাসন জাতির আত্মসম্মানের বিরোধী।"

এই অধিবেশনের পূর্ব্বে সার ফিরোজশা মেটার মৃত্যু হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জাতীয় দল কংগ্রেস বর্জ্জন করায় কংগ্রেস যে দুর্ব্বল হইয়াছিল, ভারতের প্রকৃত রাজনীতিক প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিতেছিল না, তাহা বাঙ্গালার—জাতীয় ভাবের উদ্ভব স্থান বাঙ্গালার—মডারেটরাও অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহারা মিলনের পথের সন্ধান করিতেছিলেন ফিরোজশা যে মিলনের বিরোধী ছিলেন, তাহাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই অধিবেশনে বাঙ্গালী সভাপতির সভাপতিত্বে ভূপেন্দ্রনাথ প্রমুখ বাঙ্গালার নেতারা কংগ্রেসের নিয়ম পরিবর্ত্তন করেন এবং তাহারই ফলে পরবর্ত্তী অধিবেশনে জাতীয় দলের পক্ষে কংগ্রেসে যোগদান সম্ভব হয়।



অম্বিকাচরণ মজুমদার

পরবর্ত্তী অধিবেশনের স্থান—লক্ষ্ণৌ যে অধিবেশনে মিলনের পথ মুক্ত করিবার ব্যবস্থা হয় সে অধিবেশন যেমন—এই অধিবেশনেও

তেমনই, সভাপতি—বাঙ্গালী। এবার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—পণ্ডিত জগৎ নারায়ণ ; সভাপতি—অম্বিকাচরণ মজুমদার।

এই অধিবেশনের পূর্ব্ববর্ত্তী কয়টি ব্যাপার যে মিলনের প্রয়োজন বিশেষভাবে প্রবল করিয়াছিল, তাহাও উল্লেখযোগ্য। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মুক্তি লাভ করিয়া বালগঙ্গাধর তিলক আবার রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার কম্বুকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছিল—স্বরাজে ভারতবাসীর অধিকার জন্মগত। মিসেস বেসাণ্ট তখন হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠিত করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। আবার তুর্কী জার্ম্মাণ যুদ্ধে জার্ম্মাণীর পক্ষাবলম্বন করায় মুসলমান সমাজে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে ; সামরিক প্রয়োজনে ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে ভারত সরকারের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে এবং ভারতে সমর-সরঞ্জাম প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে ও শিল্প কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে। আবার বড় লাট লর্ড হার্ডিং ইরাকে যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষ হইতে অবাধে সৈনিক ও সরঞ্জাম প্রেরণ করিয়াছেন ও বিলাতে লিখিয়াছেন—ভারতে ইংরাজ শাসনের উদ্দেশ্য ঘোষণায় আর বিলম্ব করা সঙ্গত হইবে না।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে মিলন-শঙ্খধ্বনি শ্রুত হয়। তিনি বলেন---আজ প্রয়োজনকালে আমরা মা'র আহ্বান শুনিয়া মাতৃ-মন্দিরে সমবেত হইয়াছি।

সভাপতি দীর্ঘ দশ বৎসর পরে মিলনে আনন্দিত হৃদয়ে বালগঙ্গাধর তিলক ও মতিলাল ঘোষ প্রমুখ জাতীয় দলের প্রতিনিধিগণকে কংগ্রেসে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। তাঁহার বক্তৃতা কালোপযোগী হইয়াছিল।

এই অধিবেশনে উভয় দলে মিলন ব্যতীত একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতেই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একযোগে শাসন-সংস্কারের এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। মুসলমানদিগকে স্বরাজ-সংগ্রামে সহকর্ম্মী পাইবার আশায় ও আগ্রহে এবং মামুদাবাদের মহারাজার বিশেষ চেষ্টায় কংগ্রেস এই সংস্কার-প্রস্তাবে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠন করিয়া মুসলমানদিগকে

ব্যবস্থাপক সভাসমূহে নিম্নলিখিতরূপ প্রতিনিধি লাভের অধিকার প্রদানে সম্মতি জ্ঞাপন করেন :—

		শতকরা	৫০ জন
যুক্তপ্রদেশ	...	,,	৩০ ”
বাঙ্গালা	...	,,	৪০ ”
বিহার	...	,,	২৫ ”
মধ্যপ্রদেশ	...	,,	১৫ ”
মাদ্রাজ	...	,,	১৫ ”
বোম্বাই	...	,,	এক-তৃতীয়াংশ।

মুসলমানরা যে জাতীয়তার স্থানে সাম্প্রদায়িকতার আদর করিতেছিলেন, লর্ড মিণ্টোর নিকট তাঁহাদিগের আবেদনে ও লর্ড মিণ্টোর উত্তরে তাহা জানিয়াও এবং পূর্ব্ববঙ্গে ফুলারের শাসন-কালের ঘটনা স্মরণ করিয়াও কিরূপে যে নেতারা, বিশেষ বাঙ্গালার প্রতিনিধিরা, স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় সম্মতি দিয়া মুসলমানদিগের উদ্দেশ্য সাধনে সহায় হইয়াছিলেন, তাহা অনেকেই বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিবেন। ইহার ফলে যাহা ফলিয়াছে ও ফলিতেছে, তাহাতে সে বিস্ময় শতগুণ বর্দ্ধিতই হইবে, সন্দেহ নাই।

এই ব্যবস্থা কংগ্রেসে গৃহীত হইবার পরই সৈয়দ আলী ইমাম ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে বলিয়াছিলেন—পঞ্জাবে ও বাঙ্গালায় মুসলমানরাই প্রাধান্য করিবেন এবং অন্য যে সব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাল্প সে সব প্রদেশেও তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রদেশদ্বয়ে হিন্দুদিগকে অধীনে রাখিবার ভয় দেখাইয়া অধিক অধিকার লাভ করিবেন।

কংগ্রেস এই ব্যবস্থায় সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন—এই কথা বলিয়াই মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-পদ্ধতিতে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-কেন্দ্র

স্বীকৃত হইয়াছিল; সেই শাসন-সংস্কারের বিবৃতিতে সেরূপ ব্যবস্থার বহু অনিষ্টকর ত্রুটির উল্লেখান্তে বলা হইয়াছিল—কংগ্রেস কর্ত্তৃক স্বীকৃত ও মুসলমানদিগের সম্ভুক্ত অধিকারে মুসলমানদিগকে বঞ্চিত করা যুদ্ধকালে সঙ্গত হইবে না।

যাঁহারা কখন হিন্দু মুসলমানের অধিকারভেদ কল্পনাও করিতে পারিতেন না; সেই কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্যক্তিরাও কখন এরূপ ব্যবস্থা সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিতেন না। কংগ্রেসের স্বীকৃত ব্যবস্থা ব্যবস্থাপক সভা হইতে ক্রমে চাকরীতেও প্রসারিত হইয়া জাতীয় জীবনে বিষম দৌর্ব্বল্যের কারণ হইয়াছে।



কেশবচন্দ্র সেন

সপ্তম অধ্যায়।

পরবর্ত্তী বিংশবর্ষ

লক্ষ্ণৌ নগরের অধিবেশনের পরই বালগঙ্গাধর তিলক ও মিসেস বেসাণ্ট নবোদ্যমে ভারতের নানা স্থানে রাজনীতিক প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। জার্ম্মাণ যুদ্ধের প্রভাবও অল্প হইল না। যেরূপে পঞ্জাব হইতে সৈনিক সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা এই স্থানে করিব না। ভারতীয় সৈনিকগণ ব্যতীত যে ইরাক জয় এবং হয়ত ইরাকের পথে জার্ম্মাণীর পক্ষে ভারত আক্রমণ রোধ করা সম্ভব হইত না, তাহা: আমরা দৃঢ়তা-সহকারে বলিতে পারি। তথায় অবস্থা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি। এক সময় বসোরায় ৩৫ হাজার ভারতীয় শ্রমিক ছিল। সৈনিকরা ইরাকে, গ্যালিপলীতে, ফ্রান্সে সে সব দেশের ব্যবস্থা দেখিয়া আসিতে লাগিল—তাহাদিগের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। সে সব দেশে ভারতীয় সৈনিকরা যত আদৃতই কেন হউক না, এ দেশে সরকার পূর্ব্ববৎ ব্যবহারই করিতে লাগিলেন। মিসেস বেসাণ্টকে শেষে আটক করাও হইল। ভারত-সচিব হইবার পূর্ব্বে মিষ্টার মণ্টেগু বিলাতে সত্যই বলিয়াছিলেন :—

"The Government of India is too wooden, too iron, too inelastic, too anti-diluvian, to be of any use for the modern purposes we have in view."

এই সময় ইংরাজের কাতর প্রার্থনায় ও প্ররোচনায় এবং ফ্রান্সের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশে আমেরিকা জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে মিত্রশক্তিসমূহকে যুদ্ধে সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন—দুর্ব্বল-জাতি সমূহকেও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রদান করা এবং জগতে গণতন্ত্র প্রবর্ত্তন

নিরাপদ করা হইবে। সার সুব্রহ্মণ্য আয়ার ভারতে রাজনীতিক অবস্থা, এক পত্রে, রাষ্ট্রপতি উইলসনের গোচর করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংবাদ-পত্রে এক পত্রে বিনাবিচারে লোককে আটক রাখার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া লিখেন—"কারাগারে অবরোধ ও কোন কোন স্থানে নির্জ্জন কারাকক্ষে বাসের ব্যবস্থা লোকের বিবেচনায় সতর্কতার পরিচায়ক নহে—পরন্তু প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করণ।"



মিসেস্ বেসাণ্ট

ভারত সরকার যখন এইরূপ কায করিতেছিলেন, সেই সময় বিলাতের সরকার (১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট) পার্লামেণ্টে ঘোষণা করিলেন :—

ভারতবাসীকে ভারত-শাসন কার্য্যে উত্তরোত্তর অধিক অংশ প্রদান করিয়া ভারতবর্ষকে (বৃটিশ) সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া দায়িত্বশীল শাসনাধিকার প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে তথায় ক্রমে ক্রমে স্বায়ত্ত-শাসনশীল প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ভারতে ইংরাজ শাসনের উদ্দেশ্য।

মিসেস বেসাণ্ট এই সময় মুক্তি লাভ করিলে জাতীয় দল তাঁহাকে কংগ্রেসের অধিবেশনে সভানেত্রী করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু মডারেটরা

যে কারণে বালগঙ্গাধর তিলককে ও লালা লজপত রায়কে সভাপতি করিতে শঙ্কিত ছিলেন, সেই কারণেই এই চেষ্টা ব্যর্থ করিতে উদ্যত হইলেন।

এ বার অধিবেশনের স্থান—কলিকাতা। ইহাতে প্রতিনিধি-সংখ্যা—৪ হাজার ৯ শত ৬৭।



বৈকুণ্ঠনাথ সেন

মডারেটরা মিসেস বেসান্টকে সভানেত্রী, নির্ব্বাচিত করিতে আপত্তি করিলে জাতীয় দল অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের পুরাতন কর্ম্মী রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুরকে বর্জ্জন করিয়া রবীন্দ্রনাথকে

নির্ব্বাচিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। বহু আলোচনার পর স্থির হইল—বৈকুণ্ঠনাথ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও মিসেস বেসাণ্ট সভানেত্রী হইবেন।

এই অধিবেশনের কয় দিন পূর্ব্বে ভারত সরকার ভারতে রাজদ্রোহ সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান জন্য যে সমিতি নিযুক্ত করেন সেই রৌলট কমিটীর নির্দ্ধারণানুসারে বিধিবদ্ধ আইন শেষে বিক্ষোভানলে ইন্ধনযোগ করিয়াছিল।

২০শে আগষ্টের ঘোষণার পর ভারত-সচিব মণ্টেগু ভারতে শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে অনুসন্ধান জন্য এ দেশে আসিয়াছিলেন।

এই অধিবেশনে, জাতীয় দলের প্রভাব অনুভব করিয়া, বহু মডারেট নেতা যোগ দেন নাই। সুরেন্দ্রনাথ সে নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন।

সভানেত্রী বলেন, শান্তির সময় সমৃদ্ধির ও যুদ্ধকালে বিপদবারণ জন্য ভারতের পক্ষে যেমন বৃটেনের, বৃটেনের পক্ষে তেমনই—ভারতের প্রয়োজন। তিনি উপসংহারে আটক আসামীদিগের বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই যখন শাসন-সংস্কার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তখন তাহার আলোচনার জন্য কংগ্রেসের এক অতিরিক্ত অধিবেশন আহ্বান করা হয়। তাহার পূর্ব্বে কখন কংগ্রেসের অতিরিক্ত অধিবেশন হয় নাই। অধিবেশনের স্থান—বোম্বাই; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—বিঠলভাই জাভেরভাই পেটেল; সভাপতি—সৈয়দ হাসান ইমাম। রিপোর্টে ভারতবাসীকে যে সব অধিকার প্রদানের প্রস্তাব ছিল, সে সকল জাতীয় দল হতাশাজনক বলিলেও মডারেটরা তাহাই গ্রহণ করিয়া বিস্তৃততর অধিকার লাভের সোপানরূপে ব্যবহার করিবেন—স্থির করিয়াছিলেন।

দেশের জনমত যে জাতীয় দলের পক্ষে তাহা বুঝিয়া মডারেটরা, অধিবেশনে প্রস্তাবের নিন্দা অনিবার্য্য—অনুমান করিয়া, অধিবেশন বর্জ্জন করেন।

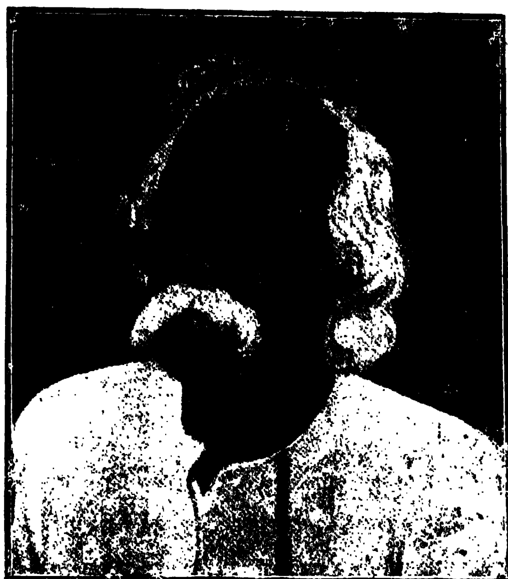
এই অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে (১৯শে জুলাই) এ দেশে অনাচার সম্বন্ধে রৌলট কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ প্রস্তাব করেন, কংগ্রেস এই কমিটীর কৃত প্রস্তাবের নিন্দা করিতেছেন এবং কংগ্রেসের বিশ্বাস, কমিটীর প্রস্তাবানুসারে কায হইলে দেশে জনমতপুষ্টির পথ বিঘ্নাস্তৃত হইবে।



হাসান ইমাম

মডারেটরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা দীর্ঘ বিংশবর্ষকাল কংগ্রেসে কেন্দ্র-স্বরূপ ছিলেন এবং দশ বৎসর তাঁহারাই কংগ্রেস অধিকার করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা যে শেষে কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা পরিতাপের বিষয়, সন্দেহ নাই। সেই জন্য এবং মুসলমানরা সাম্প্রদায়িকতা প্রবল করায় ভারত-সচিব লর্ড বার্কেনহেড পরে বলিতে সাহস করেন—কংগ্রেস ভারতবাসীর রাজনীতিক প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান বলা যায় না। আজিকার মডারেটরাই পূর্ব্বে জাতীয়-দলভুক্ত ছিলেন; তাঁহাদিগের দেশপ্রেমে সন্দেহ না থাকিলেও তাঁহারা অগ্রগতিপরায়ণ পরবর্ত্তীদিগের সহিত সমভাবে অগ্রসর হইতে

পারেন নাই--পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত কার্য্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যে অনেক সম্প্রদায়ের অনেক লোককে রাজনীতিতে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। জমীদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ব্যবসায়ী (মহারাজা) দুর্গাচরণ লাহা, চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত।



মহেন্দ্রলাল সরকার

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের সাধারণ অধিবেশন দিল্লীতে। দিল্লীতে রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় দিল্লী পঞ্জাব হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এই অধিবেশনে প্রতিনিধি-সংখ্যা—৪ হাজার ৮ শত ৬৯; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—হাকিম আজমল খাঁ। এ বার বালগঙ্গাধর তিলককে সভাপতি করিবার

প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সার ভ্যালেনটাইন চিরলের বিরুদ্ধে মামলার জন্য বিলাতে থাকায় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে সভাপতি করা হয়।

এই অধিবেশনে মডারেট নেতৃগণের মধ্যে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী উপস্থিত ছিলেন এবং স্বায়ত্ত-শাসন বিষয়ক প্রস্তাবে কিছু পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করেন।

অধিবেশনের পূর্ব্বে শিল্প কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহাতে বলা হইয়াছিল, ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠায় সাহায্য প্রদান করা সরকারের কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।

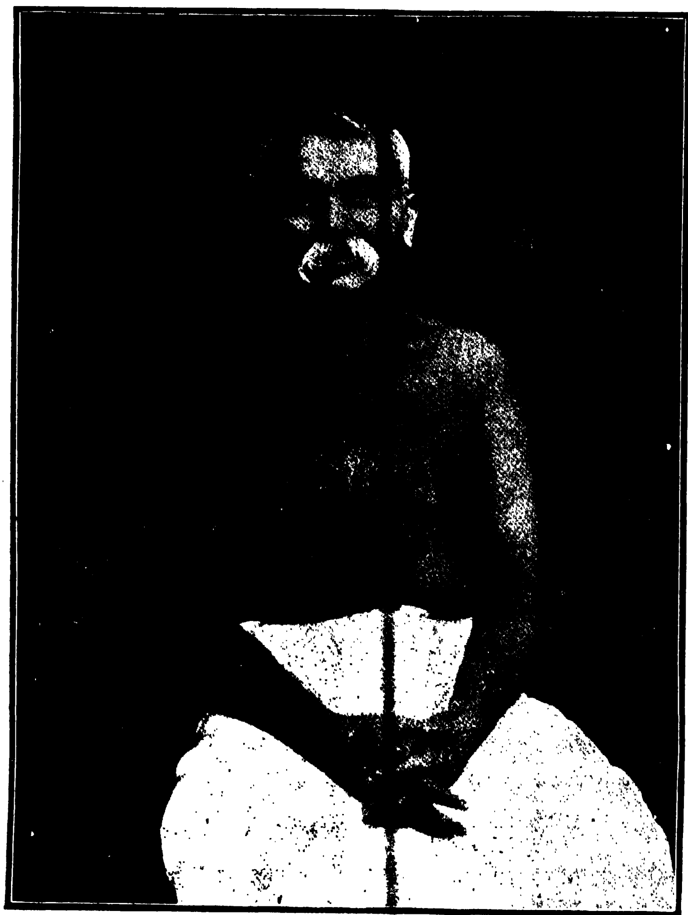
এই স্থলে বলা যাইতে পারে, রজনীকান্ত যখন স্বদেশী আন্দোলনের যুগে লিখেন—

" মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই।"

তাহার বহুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের সঙ্গে শিল্প প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথম বার মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। পরে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে সেই কার্য্য করিতে আহ্বান করা হয় এবং তিনি বলেন, যে স্বদেশী বিদেশীর বিরোধী নহে, তাহাই সাধু স্বদেশী (Honest Swadeshi.)

সুরেন্দ্রনাথ এক বার বলিয়াছিলেন, রাজনীতি অর্থনীতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। বাঙ্গালায় শিল্প প্রতিষ্ঠার ও আর্থিক উন্নতির প্রয়োজন যে বহুদিন পূর্ব্বেই অনুভূত হইয়াছিল, তাহা "হিন্দু মেলা" উপলক্ষে রচিত মনোমোহন বসুর গীতেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা মনে করেন, এই অনুভূতি বোম্বাইয়ে প্রথম অনুভূত হয়, তাহারা ভ্রান্ত। বাঙ্গালাই সর্ব্বপ্রথমে কংগ্রেসের সহিত শিল্প প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর হইতে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী পর্য্যন্ত বহু বাঙ্গালী শিল্প প্রতিষ্ঠার ও ব্যবসার জন্য পরীক্ষায় অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন—কিন্তু সে জন্য দুঃখিত হয়েন নাই। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রকে

বলিতে শুনিয়াছি, তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যমাত্র পালন করিয়াছেন। বাঙ্গালাই স্বদেশী আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করিতে পারিয়াছিল।



মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

সরকার রৌলট কমিটীর নির্দ্ধারণ অনুসারে আইন করিলেন;—দেশের লোকের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হইল। বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত ভারতীয় প্রতিনিধিদিগের সব আপত্তি পদদলিত হইল। ১৩ই মার্চ্চ রাত্রি ১টা ৩০ মিনিট পর্য্যন্ত ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন করিয়া লর্ড চেমস্-ফোর্ডের সরকার আইন বিধিবদ্ধ করিলেন।

এই সময় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নবশক্তিরূপে ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে দেখা দিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি যে সব বিস্ময়কর কার্য্য করিয়াছিলেন, সে সকলের উল্লেখের স্থান এ নহে। তিনি ফেবরারী মাসেই প্রচার করিয়াছিলেন, এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে তিনি "সত্যাগ্রহ" অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিয়া নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-ব্যবস্থা করিবেন। ১লা মার্চ্চ তিনি এক প্রতিজ্ঞাপত্র প্রচার করিলেন:—

"রৌলট আইন স্বাধীনতা ও ন্যায়ের বিরোধী এবং মানুষের যে প্রাথমিক অধিকারের উপর সরকারের ও ভারতবর্ষের নিরাপদভাব প্রতিষ্ঠিত তাহার ধ্বংসকারক বলিয়া আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ইহা বিধিবদ্ধ হইলে বিধির প্রত্যাহার না হওয়া পর্য্যন্ত এই আইন ও আমাদিগের নিযুক্ত-কমিটীর আদেশানুসারে অন্যান্য আইন মানিব না। তবে এই দ্বন্দে আমরা সম্পত্তি, শরীর ও প্রাণ সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ অনাচার সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিব।"

আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণাকল্পে সর্ব্বত্র "হরতাল" অর্থাৎ হাট বাজার কায বন্ধ করা স্থির হয়। এই উপলক্ষে ৩০শে মার্চ্চ দিল্লীতে হাঙ্গামা হইল। সৈনিকরা জনতার উপর গুলী চালাইল। নানা স্থানে বিক্ষোভব্যাপ্তি দেখা গেল। ৯ই এপ্রিল রামনবমী, সে দিন জাতীয় ভাবের প্রভাবে অমৃতসরে হিন্দু মুসলমানে মিলনের যে দৃশ্য লক্ষিত হইল, তাহা আর কখন দৃষ্ট হয় নাই। পরদিন ডেপুটী কমিশনারের আদেশে ডাক্তার কিচলু ও

সত্যপালের নির্ব্বাসনে লোক উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ইংরাজ সৈনিকরা জনতার উপর গুলী চালাইল। এই হাঙ্গামায় কয় জন য়ুরোপীয়ও নিহত হইল। পঞ্জাবের সরকার ভারত সরকারের নিকট টেলিগ্রাম করিলেন :—

"কাশুর ও অমৃতসরের মধ্যে রেল ষ্টেশন লুণ্ঠিত হইয়াছে, বৃটিশ সৈনিক নিহত ও দুই জন সামরিক কর্ম্মচারী আহত হইয়াছে। জনরব দলে দলে বিদ্রোহীরা (!) অগ্রসর হইতেছে—কাশুরে তোষাখানা আক্রান্ত হইয়াছে—লাহোর ও অমৃতসর জিলাদ্বয়ে স্থানে স্থানে প্রকাশ্য বিদ্রোহ বিদ্যমান। ছোট লাট, প্রধান সামরিক কর্ম্মচারীর ও হাইকোর্টের চীফ জাষ্টিসের সম্মতিক্রমে অনুরোধ করিতেছেন—সাধারণ আইন বাতিল করিয়া সামরিক আইন জারি করা হউক।"

শিমলা শৈলশির হইতেই বড় লাট এই প্রস্তাবে সম্মতি জানাইলেন!

ইহার ফল যাহা হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। জালিয়ানওয়ালা বাগে সভায় উপস্থিত নিরস্ত্র জনতার উপর গুলী বর্ষণে অন্ততঃ ৩ শত ৭৯ জন নিহত ও প্রায় ১২ শত লোক আহত হইয়াছিল। সে সুদীর্ঘ কথার আলোচনা এই স্থানে করিব না। ভারত-সচিবও বলিয়াছিলেন, এই ব্যবস্থায় সভ্য সরকারের আদর্শ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদিগের দ্বারা ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছিল—সমগ্র ভারতবাসীকে অপমানিত করা হইয়াছিল। যে কয় জন য়ুরোপীয় নিহত হইয়াছিল, ভারত সরকার তাহাদিগের জন্য ক্ষতিপূরণে যে অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রত্যেকের জন্য ৬৮ হাজার ৬শত ১৭ টাকা দেওয়া হয়। আর জালিয়ানওয়ালাবাগে ডায়ারের আদেশে গুলী চালনায় নিহত প্রায় ৪ শত ভারতবাসীর মধ্যে মাত্র ৪০ জনের স্বজনগণকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ যে সাহায্য প্রদান করা হয়, তাহাতে প্রত্যেকের জন্য

গড়ে ৩ শত ৪৬ টাকার অধিক প্রদান করা হয় নাই! এই যে বৈষম্য ইহার কারণ কি, তাহা ভারতবাসীর বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন—এই অমৃতসরে। এ বার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি---সন্ন্যাসী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ; সভাপতি---পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। সন্ন্যাসী হইয়াও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ যে রাজনীতিক কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন, তাহার কারণ---তিনি বলিয়াছিলেন, সে অবস্থায় সন্ন্যাসীরও কর্ত্তব্য আছে। তাঁহার আহ্বানেও মডারেটরা কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত হয়েন নাই!

এই অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে শাসন-সংস্কার-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রাক্কালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের ঘোষণা প্রচারিত হয়। তাহাতে তিনি বলেন :—

"ভারতের প্রজাগণ প্রতিনিধিমূলক শাসন লাভের জন্য দিন দিন যে অধিক আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিতেছেন, তাহা আমি সহানুভূতি সহকারে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। দেশের শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান জনসমূহের মধ্যে ঐ আগ্রহ যে প্রথমে অল্প হইতে এক্ষণে বিশেষরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাও আমি লক্ষ্য করিতেছি। * * * এত দিন বৃটেনের সহিত সংস্পর্শে যদি ভারতবাসীর হৃদয়ে উহার উদ্ভব না হইত, তবে বলা যাইতে পারিত—ভারতে বৃটিশ শাসন উপযুক্ত ফল প্রসব করে নাই।"

পুনশ্চ—

"আমার প্রজাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রবল রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া আইনের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন, তাঁহারা যেন ভবিষ্যতে সে মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যত্নবান হয়েন। * * আজ এক নবযুগের আরম্ভ হইতেছে। এই নবযুগ-প্রারম্ভে পূর্ব্বযুগের বিবাদ বিসম্বাদ শত্রুতা সকলই ভুলিতে হইবে।"

পঞ্জাবে অনাচারের তদন্ত জন্য সরকার যেমন এক সমিতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কংগ্রেসের পক্ষ হইতেও তেমনই এক সমিতি গঠিত হইয়াছিল। অমৃতসরের অধিবেশনের পর উভয় সমিতির রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। আবার মিত্র-শক্তিরা পরাজিত তুর্কীকে যে সন্ধিসর্ত্ত দিলেন, তাহাতে মুসলমানরা সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না।

এই অবস্থায় নিম্নলিখিত বিষয় চতুষ্টয়ের বিবেচনার জন্য ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৪টা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অতিরিক্ত অধিবেশন হইলঃ—

(১) পঞ্জাবী ব্যাপার

(২) খিলাফৎ-সমস্যা

(৩) শাসন-সংস্কারের নিয়ম

(৪) সহযোগিতা-বর্জ্জন

এই অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী; সভাপতি—লালা লজপত রায়। লালাজী মার্কিণ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি পাইয়া ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতে আসিয়াছিলেন।



ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী

বিষয়-নির্দ্ধারণ সমিতিতে দুই দিন বিচার-বিবেচনার পর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর প্রস্তাবিত (সরকারের সহিত) সহযোগিতা-বর্জ্জন প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রকাশ্য অধিবেশনে ইহার পক্ষে ১ হাজার ৮ শত ৫২ জন

ও বিপিনচন্দ্র পালের সংশোধক প্রস্তাবের পক্ষে ৮ শত ৮৩ জন ভোট দেন। প্রস্তাবে অসহযোগ নীতির প্রথম সোপানের উল্লেখ করা হয়—

(১) সরকার-দত্ত উপাধি ও অবৈতনিক চাকরী ত্যাগ।

(২) সরকারের "লেভী" দরবার প্রভৃতিতে যোগদান না করা।

(৩) সরকারের যেকোনরূপ সাহায্য-প্রাপ্ত স্কুল কলেজ হইতে ছাত্রদিগকে ছাড়াইয়া লওয়া এবং জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

(৪) আইন ব্যবসায়ীদিগের সরকারী আদালতে ব্যবসা ত্যাগ ও সালিসী বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করা।

(৫) সামরিক জাতিগণের, কেরাণীদিগের ও শ্রমিকদিগের মেসোপোটেমিয়ায় (ইরাকে) চাকরী গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা।

(৬) নূতন ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচনপ্রার্থী না হওয়া।



লালা লাজপত রায়

(কংগ্রেসের নিষেধ সত্ত্বেও যাঁহারা নির্ব্বাচন-প্রার্থী হইবেন, ভোটাররা তাঁহাদিগকে ভোট দিবেন না)

এই সব ব্যবস্থায় তাঁহার সম্মতি না থাকিলেও সভাপতি বহুমতের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তাবানুসারে কায করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

লালাজী সৌজন্যের ও অতিথিসৎকারে আগ্রহের জন্য বাঙ্গালাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলেন, বাঙ্গালার নিকট তিনি

ইহাই আশা করিয়াছিলেন। রাজনীতিক ধীশক্তিতে বাঙ্গালাই ভারতে নেতৃত্ব করিয়া আসিয়াছে। * * বাঙ্গালাই ভারতবর্ষে জাতীয়তার পবিত্রতম আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল—বাঙ্গালাই ত্যাগের ও সেবার আদর্শে দেশভক্তি সমুজ্জ্বল করিয়াছে। * * বাঙ্গালার ভাবপ্রবণতার ও দেশ-প্রেমের গভীরতার তুলনা নাই।

দেশে নূতন ভাব ও বিক্ষোভ প্রবল হইয়া উঠিল। সেই অবস্থায় নাগপুরে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হইল। লোক কিরূপ আগ্রহ-সহকারে এই অধিবেশনে অসহযোগ সম্বন্ধে নির্দ্ধারণের প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহা প্রতিনিধি-সংখ্যাতেই বুঝিতে পারা যায়। এ বার প্রতিনিধি-সংখ্যা প্রায় ২২ হাজার। মণ্ডপে লোকের আধিক্যে দুর্ঘটনাও ঘটিয়াছিল। শেঠ যমুনালাল বাজাজ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েন এবং মাদ্রাজের প্রবীণ নেতা বিজয়রাঘবাচারিয়াকে সভাপতি করা হয়। নানা দেশের শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধীয় আইনে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য যে বিজয় রাঘবকে সভাপতি নির্ব্বাচনের অন্যতম কারণ ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহার আর এক বৈশিষ্ট্য—অকুণ্ঠকণ্ঠে ও কাহারও মুখ না চাহিয়া মতপ্রকাশ-নৈপুণ্য। তিনি অভিভাষণে প্রথমেই বলেন, যদি বাল-গঙ্গাধর তিলক জীবিত থাকিতেন, তবে আমাদিগের জটিল রাজনীতিক অবস্থায় তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিলেই সঙ্গত হইত। বিজয়রাঘব অসাধারণ দক্ষতা সহকারে অসহযোগ সম্বন্ধে পূর্ব্বাধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের বিশ্লেষণ



বিজয়রাঘব আচারিয়া

করেন এবং নানা বিষয়ে প্রস্তাবের দৌর্ব্বল্য দেখাইয়া দেন। উপসংহারে তিনি বলেন :—

"মূল কথা এই যে, এ দেশে বৃটিশ শাসন ভারতবাসীর সহিত শ্বেতাঙ্গদিগের সহযোগিতা রর্জ্জনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অবস্থা ক্রমে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। * * দেশের লোক এ দেশে দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠাবিষয়ে এক মত। * * বর্ত্তমান সময়ে ভারতের ভাগ্য দুই জনের উপর নির্ভর করিতেছে।—ইঁহারা—(১) (ভারত-সচিব) মিষ্টার মণ্টেগু ও (২) মহাত্মা গান্ধী।"

অসহযোগ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে মতভেদ লক্ষিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে অসহযোগই যে ভারতবাসীর অবলম্বনীয় সে বিষয়ে মতভেদ না থাকিলেও পদ্ধতি সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়—তাহাতে কারণের উল্লেখান্তে বলা হয় "কংগ্রেস অহিংসাত্মক অসহযোগনীতি গ্রহণ করিয়া ঘোষণা করিতেছেন, এই অহিংসামূলক সহযোগবর্জ্জন-ব্যবস্থা সমগ্র বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের সহিত স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে সর্ব্বসংস্রব পরিত্যাগ করিবার জন্য"—প্রস্তুত হইতে হইবে।

এই অধিবেশনে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্ধারিত হয় :—

"ন্যায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতবাসী কর্ত্তৃক স্বরাজ-লাভই ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্য।"

এই অধিবেশনের পর ঘটনার স্রোতঃ দ্রুতবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। গান্ধীজী দেশবাসীকে আত্মস্থ হইতে বলিলেন। ইহা সেই পুরাতন কথা—বহুযুগ পূর্ব্বে ভারতের পুণ্যভূমিতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল —"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং" "সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।"

কংগ্রেসের নির্দ্ধারণ শিরোধার্য্য করিয়া দেশের অধিকাংশ লোক নূতন ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচন বর্জ্জন করেন—অনেক নির্ব্বাচনকেন্দ্রে ভোটার সমাগম হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পরবর্ত্তী ১৫ বৎসরের কংগ্রেসের ইতিহাসের সহিত অসহযোগ আন্দোলনের ইতিহাস অবিচ্ছিন্নভাবে বিজড়িত। কিন্তু এখনও সে ইতিহাস লিখিত হয় নাই—লিখিবার সময়ও হয় নাই। এই পঞ্চদশ বৎসরের ভারতের ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস—ত্যাগের ইতিহাস। নেতার পর নেতা কারাবরণ করিয়াছেন—এক এক দিন দুই শতধিক স্বেচ্ছাসেবক কলিকাতাতেই গ্রেপ্তার হইয়া দণ্ডিত হইয়াছে—আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার কল্পনাও করে নাই। নানাস্থানে পুলিসের গুলীতে লোক প্রাণ হারাইয়াছে—সাহস হারায় নাই।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে নূতন শাসন-পদ্ধতিতে গঠিত ব্যবস্থাপক সভাগুলির উদ্বোধন করিতে রাজ-পিতৃব্য ডিউক অব কনট ভারতে আগমন করেন এবং সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের যে বাণী পঠিত হয় তাহাতে ছিল :—

"বহুবৎসর হইতে—হয়ত কয় পুরুষ হইতে দেশের হিতকামী ভারতীয়রা স্বদেশে স্বরাজের স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছেন। আজ আমার সম্রাজ্যমধ্যে আপনাদিগের স্বরাজেরসূচনা হইল।"

কলিকাতায় ছাত্রগণের মধ্যে বিশেষ বিক্ষোভবিকাশ হয় এবং পঞ্জাবে আকালী শিখদিগের আন্দোলন প্রবল হয়। মাদ্রাজে মোপলা হাঙ্গামা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লর্ড চেমসফোর্ডের পর লর্ড রেডিং ভারতে বড় লাট হইয়া আসিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মধ্যস্থতায় তাঁহার সহিত গান্ধীজীর সাক্ষাৎ ও রাজনীতিক অবস্থার আলোচনা হয়। কিন্তু তাহাতে ঈপ্সিত ফললাভ হয় নাই। নভেম্বর মাসে যুবরাজ (বর্ত্তমান সম্রাট—অষ্টম এডওয়ার্ড) ভারতে আগমন করেন। ইহার পূর্ব্বেই প্রথম ভারতীয় গভর্ণর লর্ড সিংহ—ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত মতের অনৈক্যহেতু পদত্যাগ করেন। যুবরাজ যে দিন বোম্বাইয়ে উপনীত হয়েন, সে দিন তথায় দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় এবং তাহাতে

হিংসার বিকাশে গান্ধীজী মর্ম্মাহত হয়েন। পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর গ্রেপ্তারে যুক্ত-প্রদেশে ও চিত্তরঞ্জন দাশের গ্রেপ্তারে বাঙ্গালায় বিশেষ চাঞ্চল্য উদ্ভূত হয়। মীমাংসার চেষ্টায় লর্ড রেডিংএর বন্ধু পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কলিকাতায় আগমন করেন। সরকার কারাগারে তাঁহার সহিত চিত্তরঞ্জনের সাক্ষাতের ও গান্ধীজীর সহিত "ক্লিয়ার দি লাইন" তারের ব্যবস্থা করিয়া দেন। কিন্তু তিনি যে সর্ত্তে যুবরাজের আগমন বর্জ্জনের প্রস্তাব করেন, গান্ধীজী তাহাতে সম্মত হয়েন নাই।

এই পরিবেষ্টনে আমেদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। তাহাতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—বল্লবভাই পেটেল; সভাপতি—চিত্তরঞ্জন কারারুদ্ধ থাকায়—হাকিম আজমল খাঁ।



হাকিম আজমল খাঁ

সভাপতির অভিভাষণ পঠিত হইবার পর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু চিত্তরঞ্জনের বক্তব্য (অসমাপ্ত অভিভাষণ) পাঠ করেন।

এই অধিবেশনে একটি-মাত্র প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই প্রস্তাবে দেশবাসীকে অসহযোগের কার্য্য-পদ্ধতি আরও আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিয়া কায করিতে উপদেশ দেওয়া হয়। গান্ধীজী এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন।

এই অধিবেশনেই কংগ্রেসে গান্ধীজীর প্রভাব প্রবলতম ভাবে প্রকাশ পায়। এই অধিবেশনের পরই গান্ধীজী দেশবাসীকে আইন অমান্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিতে থাকেন। ফেব্রুয়ারী মাসে যুক্তপ্রদেশে চৌরী-চৌরায় পুলিসের সহিত অসহযোগীদিগের সঙ্ঘর্ষে ক্ষিপ্ত জনতা থানাবাড়ীতে অগ্নিযোগ করে ও তাহাতে পুলিসের ২২জন লোক প্রাণ হারাইলে কংগ্রেসের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি প্রচার করেন—যতদিন জনগণ অহিংসায় অবিচলিত থাকিতে না পারিবে, ততদিন আইন অমান্য করা হইবে না।

১০ই মার্চ্চ রাজদ্রোহের অভিযোগে গান্ধীজীকে ৬ বৎসরের জন্য বিনাশ্রমে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন—গয়ায়। তাহাতে প্রতিনিধি-সংখ্যা ৩ হাজার ২ শত ৪৮; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—ব্রজকিশোর প্রসাদ; সভাপতি—চিত্তরঞ্জন দাশ।



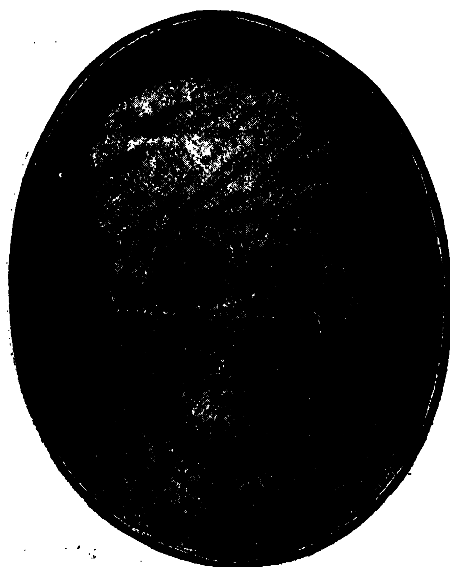
চিত্তরঞ্জন দাশ

চিত্তরঞ্জন ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের পক্ষপাতী ছিলেন। এই অধিবেশনের পূর্ব্বে চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনে সভা-নেত্রী হইয়া তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বাসন্তী দাশ যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে কংগ্রেসে গৃহীত ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশিত হইয়াছিল। এ বার সভাপতির অভিভাষণে তিনি সেই মত ব্যক্ত করিলেন।

গান্ধীজীর অনুরক্ত ভক্ত রাজাগোপালাচারী যে প্রস্তাব করেন—তাহাতে বলা হয়—"অহিংস অসহযোগের অত্যাবশ্যক কার্য্য-পদ্ধতিরূপে দেশবাসীর পক্ষে (ব্যবস্থাপক সভার) আগামী নির্ব্বাচনও বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।"

শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন; তাহাতে বলা হয়—"কংগ্রেস ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন অধিকতর সফল করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন, ভোটাররা আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেস-কর্ম্মীদিগকেই ভোট দিবেন এবং সেই সকল কর্ম্মী নির্ব্বাচিত হইলে ব্যবস্থাপক সভায় আসন গ্রহণ করিবেন না।"

বহুমতে সংশোধক প্রস্তাব ত্যক্ত হয়।



আবুল কালাম আজাদ

পরাভূত হইয়া চিত্তরঞ্জন, কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া, নূতন দল গঠিত করেন। ইহা স্বরাজ্য দল নামে অভিহিত হয়। কংগ্রেসের অধিবেশনে শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার এই দলের পক্ষ হইতে বলিয়াছিলেন, নির্ব্বাচিত কংগ্রেস-কর্ম্মীরা ব্যবস্থাপক সভায় আসন গ্রহণ করিবেন না; স্বরাজ্য দলের কার্য্য-পদ্ধতিতে কিন্তু তাহা বলা হইল না। তাহাতে বলা হইল—"নির্ব্বাচিত হইবার পরই সদস্যরা দল কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত দাবী জাতির পক্ষ হইতে উপস্থাপিত করিয়া সরকারকে

তাহা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে পূর্ণ করিতে বলিবেন ; এবং সরকার যদি সন্তোষজনকরূপে সে দাবি পূর্ণ না করেন, তবে সদস্যদিগের পক্ষে সমভাবে ক্রমাগত সরকারের কায প্রতিরোধের সময় উপস্থিত হইবে।"

পরবৎসর, অবস্থা বিবেচনা করিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী এক অতিরিক্ত অধিবেশন আহ্বান করেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে এই অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—ডাক্তার আন্সারী ; সভাপতি—আবুল কালাম আজাদ।

মহম্মদ আলী প্রস্তাব করেন :—

"কংগ্রেস যে অহিংস অসহযোগ নীতিতে অবিচলিত, সেই উক্তির পুনরুক্তি করিয়া কংগ্রেস ঘোষণা করিতেছেন যে, ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশে যে সব কংগ্রেস-কর্ম্মীর ধর্ম্মগত বা বিবেকগত বাধা নাই, তাঁহারা আগামী সদস্য-নির্ব্বাচনে ভোট দিতে বা সদস্যপদপ্রার্থী হইতে পারেন ; সুতরাং কংগ্রেস ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন স্থগিত করিতেছেন।"

তিনি বলেন,—মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে জানাইয়াছেন :—

"আপনারা আমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-পদ্ধতিতেই অবিচলিত থাকুন, এমন কথা আমি বলি না। দেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া আপনারা যদি মনে করেন, পদ্ধতির দুই একটি অংশ ত্যক্ত বা পরিবর্ত্তিত হইলে ভাল হয়, তবে আমি আপনাদিগকে সেই সব অংশ পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্তন করিতে বলিতেছি।"

কিরূপে—কোন্ সূত্রে গান্ধীজী তাঁহাকে এই কথা জানাইয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই।

এই অধিবেশনে নিজ মত প্রতিষ্ঠার জন্য চিত্তরঞ্জন বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয়।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের সাধারণ অধিবেশনের স্থান—কোকনদা (মাদ্রাজ)। এ বার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—কোণ্ডা বেঙ্কটাপ্পা ; সভাপতি—মহম্মদ

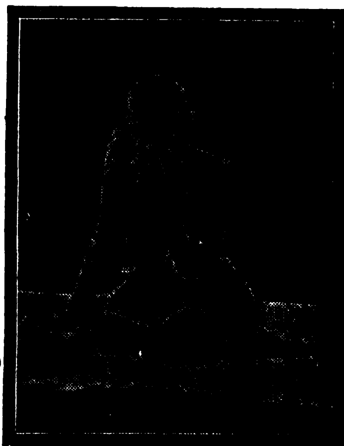
আলী। সভাপতির অভিভাষণ দীর্ঘ এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবমুক্ত নহে। বাস্তবিক শৌকত আলী ও মহম্মদ আলী খিলাফৎ আন্দোলনের জন্য ও রাজনীতিক প্রয়োজনে গান্ধীজীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেও সাম্প্রদায়িকতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কোহাটে তাহা বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। অভিভাষণে তিনি এ দেশের সাংবাদিকদিগকেও উপদেশ দিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই!



মহম্মদ আলি

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন-স্থান—বেলগাঁও; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডে, সভাপতি—মহাত্মা গান্ধী।

এই অধিবেশনে এক পক্ষে গান্ধীজী, অপর পক্ষে অর্থাৎ স্বরাজ্য দলের পক্ষে চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরু যে মীমাংসায় উপনীত হয়েন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়। নাগপুরের অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল—প্রকৃত পক্ষে এই অধিবেশনে তাহা ত্যক্ত হয় এবং অসহযোগের নামমাত্র অবশিষ্ট থাকে।



মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন—কাণপুরে। এ বার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—ডাক্তার মুরারীলাল; সভানেত্রী—শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।

এই অধিবেশনের পূর্ব্বে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হইয়াছিল।

সভানেত্রীর যে লিখিত অভিভাষণ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, তিনি তাহা পাঠ না করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক বাগ্মিতা সহকারে এক স্বতন্ত্র বক্তৃতা করেন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের অধিবেশনের স্থান—গৌহাটী। এবার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—তরুণরাম ফুকন; সভাপতি—মাদ্রাজের শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার।

শ্রীনিবাস স্বরাজ্য দলের অন্যতম প্রধান কর্ম্মী এবং ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনের বিরোধী।



শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন—মাদ্রাজে। এ বার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—মথুরঙ্গ মুদেলিয়ার; সভাপতি—দিল্লীর ডাক্তার আন্সারী।

এই বৎসরের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—(সাইমন) কমিশন নিয়োগ। ভারত শাসন আইনের ৪৮ এ ধারার নির্দ্ধারণানুসারে শাসন-পদ্ধতি, শিক্ষা-বিস্তার; প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের উন্নতি প্রভৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া নির্দ্ধারণ জ্ঞাপন জন্য এই কমিশন গঠিত হয়। ইহাতে ভারতবাসীর স্থান না থাকায় জাতীয় দল ইহা বর্জ্জন করেন। শেষে সরকার

এই কমিশনের সঙ্গে এক ভারতীয় কমিটী নিযুক্ত করেন। জাতীয় দল ইহা জাতির আত্মসম্মানের পক্ষে হানিজনক মনে করে।



ডাক্তার আনসারি

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন—কলিকাতায়। এবার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত; সভাপতি—পণ্ডিত মতিলাল নেহরু।

এই অধিবেশনে যুবক কর্ম্মী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি স্বরাজের যে ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা গৃহীত হয় নাই বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী অধিবেশনে সভাপতির আসন হইতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সেই অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর বড়লাট লর্ড আরউইন বিলাতের মন্ত্রিমণ্ডলের অভিপ্রায়ানুসারে ব্যক্ত করেন,—১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ঘোষণায় ভারতে যে দায়িত্বশীল শাসন-প্রতিষ্ঠা এ দেশে ইংরাজ শাসনের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, তাহা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব্বেই ঘোষণা করা হয়, পরবৎসর ভারত শাসন সম্বন্ধে আলোচনার জন্য বিলাতে এক "গোল টেবিল"

বৈঠক বসিবে—অর্থাৎ এক সম্মিলনে প্রতিনিধিরা একত্র বসিয়া আলোচনা করিবেন। ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে—অর্থাৎ কংগ্রেসের অধিবেশনের কয়দিন মাত্র পূর্ব্বে বড় লাট গান্ধীজী ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে আহ্বান করিয়া তাঁহারা (কংগ্রেসের পক্ষ হইতে) এই বৈঠকে যোগ দিতে সম্মত আছেন কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা যে সব সর্ত্তে সম্মতি দিতে ও কংগ্রেসকে সম্মত করাইতে চেষ্টা করিবেন বলে—বড়লাট সে সব গ্রাহ্য না করায় মীমাংসা অসম্ভব হয়।



শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার

লাহোরের অধিবেশনে (১৯২৯ খৃষ্টাব্দ) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—ডাক্তার সৈফুদ্দীন কিচলু: সভাপতি—জওহরলাল নেহরু। এই অধিবেশনেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা (ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব-শাসন নহে) কংগ্রেসের কাম্য বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

ইহার পরে গান্ধীজী আইন ভঙ্গে নেতৃত্ব করেন; কিন্তু সর্ব্বতোভাবে অহিংসায় অবিচলিত থাকিবার ব্যবস্থা করেন।

কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি সংশোধিত ফৌজদারী আইনের বিধানে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত হয় এবং ফলে অধিকাংশ প্রধান কংগ্রেস-কর্ম্মী কারারুদ্ধ হয়েন।



পণ্ডিত মতিলাল নেহরু

এই অবস্থায় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় নাই। কিন্তু মীমাংসার জন্য নানা চেষ্টা হইতেছিল। সার তেজ বাহাদুর সপরু ও মিষ্টার জয়াকর এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া ব্যর্থকাম হয়েন।

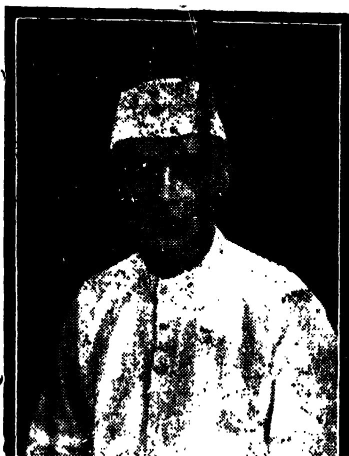
এ দিকে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর বিলাতে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ "গোল টেবিল" বৈঠকের উদ্বোধন করেন। কেহ কেহ মনে করেন, সাইমন কমিশন সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ব্যবস্থার উচ্ছেদ-সাধন প্রভৃতি যে সব প্রস্তাব করেন, সে সকল জাতীয়তার পরিপোষক বলিয়া বিলাতের রাজনীতিকদিগের নিকট আদৃত হয় নাই এবং তাহাই "গোল টেবিল" বৈঠক আহ্বানের অন্যতম কারণ।

পরবৎসর ১৯শে জানুয়ারী তারিখে বিলাতে প্রধান মন্ত্রী



যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত

বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদান সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রকাশ করেন, তদনুসারে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে বড়লাট লর্ড আরউইন কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি বে-আইনী বলিয়া যে ঘোষণা প্রচার করা হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাহার করেন এবং যাহাতে কংগ্রেসের নেতারা স্বচ্ছন্দে পরামর্শ করিতে পারেন, সেই জন্য কারারুদ্ধ নেতৃগণকে মুক্তি দেন। তাঁহার বিবৃতিতে বলা হয় :—



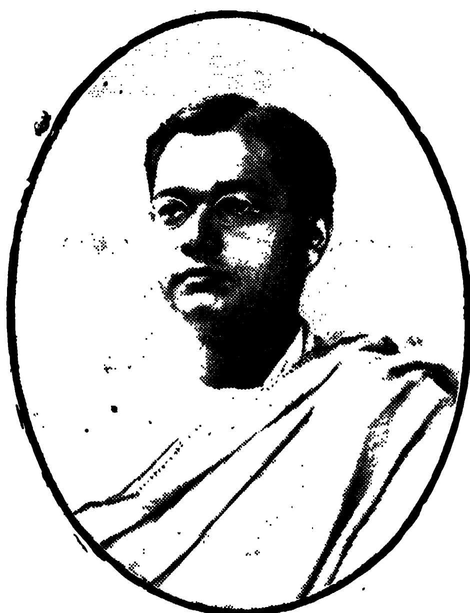
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু

"Our action has been taken in pursuance of a sincere desire to assist the creation of such peaceful conditions as would enable the Government to implement the understanding given by the Prime Minister that if civil quiet were proclaimed and assured, Government would not be backward in response."

৫ই মার্চ্চ তারিখে গান্ধী-আরউইন চুক্তির সর্ত্ত সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

এ বার করাচিতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। তাহাতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—ডাক্তার চৈতরাম গিদওয়ানী; সভাপতি—বল্লভভাই পেটেল। এই অধিবেশনে তরুণ দল গান্ধীজী প্রভৃতির মত পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন।

গান্ধীজী একক কংগ্রেসের পক্ষ হইতে "গোল টেবিল" বৈঠকের পরবর্ত্তী অধিবেশনে যোগ দিতে বিলাতে গমন করেন। কিন্তু আইরিশ নেতা ডিভ্যালেরা যেরূপ সর্ত্তে বিলাতের সহিত মীমাংসার আলোচনা করিবার জন্য আয়ার্লণ্ড হইতে প্রতিনিধি পাঠাইতে সম্মত হইয়াছিলেন, গান্ধীজী



সুভাষচন্দ্র বসু

কংগ্রেসের পক্ষে সেরূপ কোন সর্ত্ত করেন নাই! ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর বিলাতে আইরিশদিগের সহিত যে আলোচনা হয়, তাঁহার জন্য প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জকে মিষ্টার ডিভ্যালেরাকে দক্ষিণ আয়ার্লণ্ডের জনগণের নেতা স্বীকার করিয়া লিখিতে হইয়াছিল, তাঁহাকে যে আলোচনা-সভায় আহ্বান করা হইতেছে, তাহার উদ্দেশ্য—

'When we can meet your delegates as spokesmen of the people whom you represent, with a view to ascertain how the association of Ireland with the community of nations known as the British Empire may best be reconciled with national aspiration"

তখন ডিভ্যালেরার দাবীতে কেবল যে তাঁহার প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠানের কারারুদ্ধ সদস্যদিগকেই মুক্তি প্রদান করিতে হইয়াছিল তাহা নহে, পরন্তু লয়েড জর্জ্জ বাধ্য হইয়া, সামরিক বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, মাউণ্টজয় কারাগারে বদ্ধ কমাণ্ডাণ্ট ম্যাক্‌কিয়নকেও মুক্তি দিয়া প্রতিনিধিদলে যোগ দিবার সুযোগ দিয়াছিলেন।



বল্লভভাই পেটেল

সেরূপ কোন সর্ত্ত করেন নাই; তাঁহার পরিচালিত আইনভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দিয়া যে সহস্র সহস্র নরনারী তখনও কারাগারে বদ্ধ ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগের মুক্তি ব্যতীত কংগ্রেসের পক্ষ হইতে, "গোল টেবিল" বৈঠকে যোগ দিতে যাইতে পারেন না, এমন কথা তিনি বলিলেন না! অথচ মনে হয়, তিনি যদি সে কথা বলিতেন, তবে, তাঁহারই মত কাযের জন্য যাঁহারা তখনও দণ্ড ভোগ করিতেছিলেন, তাঁহারা মুক্তি লাভ

করিতেন। বাঙ্গালার মডারেটদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রতিনিধি মনোনীত হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা যেমন সেরূপ কথা বলেন নাই, গান্ধীজীও তেমনই—সে বিষয়ের উল্লেখ করেন নাই। কংগ্রেসের মত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির পক্ষে এইরূপ কার্য্য সঙ্গত হইয়াছিল কি না, তাহা সহজেই বলিতে পারা যায়।

"গোল টেবিল" বৈঠকে গান্ধীজীর চেষ্টাতেও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয় নাই। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের হিন্দু-মুসলমান চুক্তি-বিষবৃক্ষের ফল তখন ফলিয়াছে। আবার ইংরাজ রাজনীতিদিগের ও গার্ভিন প্রমুখ সাংবাদিকদিগের কার্য্যেও তখন মুসলমানদিগের আশা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। কোনরূপ মীমাংসা করিতে না পারিয়াই গান্ধীজী প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এ দিকে তাঁহার কোন কোন সহকর্ম্মী আইন-অমান্য আন্দোলন পুনরায় প্রবর্ত্তিত করিবার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ফলে সরকার আবার চণ্ডনীতির দ্বারা সে আন্দোলন দলনের চেষ্টা করিলেন। আবার নেতৃগণের আটক হইল। কংগ্রেসের অধিবেশন বন্ধ হইল।



শেঠ রণছোড়লাল

এই অবস্থায় ১৯৩২ ও ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে—দিল্লীতে ও কলিকাতায়, সরকারের আদেশ অমান্য করিয়া, যে দুইটি অধিবেশন—সেই দুইটিকে অধিবেশন না বলিয়া অধিবেশনের চেষ্টা বলাই সঙ্গত। কারণ, কোন অধিবেশনই সম্পন্ন হইতে পারে নাই। দিল্লীতে সভাপতি—শেঠ রণছোড়লাল। কলিকাতায় সভানেত্রী—শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা।

ইহার পর সরকার গান্ধীজীকে মুক্তি দেন ও কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আইন-ভঙ্গ আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়।

ফলে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এ বার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—কে, এফ, নরীম্যান; সভাপতি—বিহারের রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

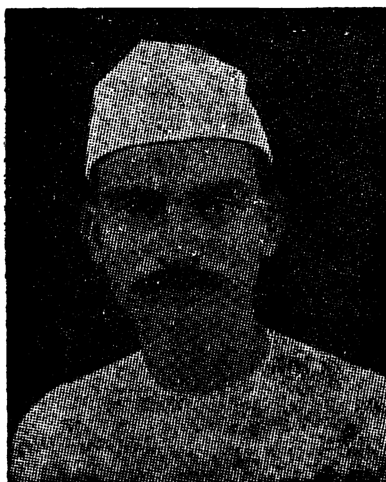
কয় বৎসর পরে, পরিবর্ত্তিত অবস্থায়, এই অধিবেশন। রাজেন্দ্র বাবুর দীর্ঘ অভিভাষণে অনেক কথা ছিল। কিন্তু দেশবাসী তাহাতে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন নির্দ্দেশ-সন্ধান পায় নাই।



শ্রীমতী নেলী সেন গুপ্তা

এখন নেতৃগণের পক্ষে সেই সন্ধান দেওয়াই সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন

কংগ্রেসের স্থিতিকাল ৫০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই ৫০ বৎসরে ভারতে রাজনীতিক পরিবর্ত্তন অল্প হয় নাই—সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের আশা ও আকাঙ্ক্ষারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সে সকল কংগ্রেসে প্রতিফলিত হইয়াছে। এক দিকে যেমন লর্ড ল্যান্সডাউনের শাসনকালে প্রবর্ত্তিত শাসন-সংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া স্বরাজ লাভে ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা সঙ্গত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, অপর দিকে তেমনই দেশের লোক ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন ব্যতীত সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছে না। আইরিশ নেতা পার্ণেল বলিয়াছিলেন, কোন জাতির আকাঙ্ক্ষার সীমা নির্দ্ধারণের অধিকার কাহারও নাই—আকাঙ্ক্ষা অবস্থানুসারে বিস্তার লাভ করে।

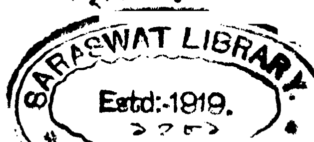


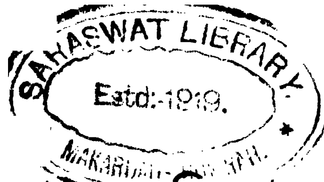
রাজেন্দ্রপ্রসাদ

ভারতবর্ষে গত ৫০ বৎসরে দেশাত্মবোধ-বিকাশ লক্ষ্য করিয়া আমরা যেমন আশায় উৎফুল্ল হইয়াছি—যেমন ধন্য হইয়াছি, তেমনই কর্ত্তব্যের গুরুত্বও উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছি। ভারতবর্ষের রাজনীতিক গগনে তরুণ-অরুণোদয়-সূচনা লক্ষ্য করিয়া—ভারতের জয়ধ্বনি করিয়া এই পুস্তক সমাপ্ত করিতেছি।

সম্পূর্ণ।

১লা ফাল্গুন, ১৩৪২





কংগ্রেসের অধিবেশন-তালিকা

স্থান		সভাপতি	অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।
বোম্বাই	১৮৮৫	উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
কলিকাতা	১৮৮৬	দাদাভাই নৌরজী	রাজেন্দ্রলাল মিত্র।
মান্দ্রাজ	১৮৮৭	বদরুদ্দীন তায়াবজী	তাঞ্জোর মাধবরাও।
এলহাবাদ	১৮৮৮	জর্জ্জ ইউল	পণ্ডিতঅযোধ্যানাথ।
বোম্বাই	১৮৮৯	উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ	ফিরোজশা মেটা।
কলিকাতা	১৮৯০	ফিরোজশা মেটা	মনোমোহন ঘোষ।
নাগপুর	১৮৯১	আনন্দ চার্লু	নারায়ণস্বামী নাইডু।
এলাহাবাদ	১৮৯২	উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ।
লাহোর	১৮৯৩	দাদাভাই নৌরজী	সর্দ্দার দয়াল সিংহ মাজিথিয়া।
মান্দ্রাজ	১৮৯৪	আলফ্রেড ওয়েব	রঙ্গিয়া নাইডু।
পুণা	১৮৯৫	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	এস্, এম্, ভিড়ে।
কলিকাতা	১৮৯৬	রহিমতুল্লা মহম্মদ সিয়ানী	রমেশচন্দ্র মিত্র।
অমরাবতী	১৮৯৭	শঙ্করণ নায়ার	গণেশ শ্রীকৃষ্ণ খপর্দ্দে।
মান্দ্রাজ	১৮৯৮	আনন্দমোহন বসু	সুব্বারাও পান্তলু।
লক্ষৌ	১৮৯৯	রমেশচন্দ্র দত্ত	বংশীলাল সিংহ।
লাহোর	১৯০০	নারায়ণ গণেশ চন্দ্রাবরকর	কালীপ্রসন্ন রায়।
কলিকাতা	১৯০১	দীনাশা ইদালজী ওয়াচা	জগদিন্দ্রনাথ রায়।
আমেদাবাদ	১৯০২	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	অম্বালাল সাকেরলাল দেশাই।
মান্দ্রাজ	১৯০৩	লালমোহন ঘোষ	সৈয়দ মহম্মদ।

কংগ্রেসের অধিবেশন-তালিকা

স্থান		সভাপতি	অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।
বোম্বাই	১৯০৪	হেনরী কটন	ফিরোজশা মেটা।
বারাণসী	১৯০৫	গোপালকৃষ্ণ গোখলে	মুন্সী মাধোলাল।
কলিকাতা	১৯০৬	দাদাভাই নৌরজী	রাসবিহারী ঘোষ।
সুরাট	১৯০৭	রাসবিহারী ঘোষ	ত্রিভুবনদাস মালবী।
মাদ্রাজ	১৯০৮	ঐ	কৃষ্ণস্বামী রাও।
লাহোর	১৯০৯	পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য	লালা হরকিষণলাল।
এলাহাবাদ	১৯১০	উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ	পণ্ডিত সুন্দরলাল।
কলিকাতা	১৯১১	পণ্ডিত বিষণনারায়ণ দার	ভূপেন্দ্রনাথ বসু।
পাটনা	১৯১২	আর, এন্, মুধলকার	মজরল হক।
করাচী	১৯১৩	সৈয়দ মহম্মদ	হরচন্দ্র বিষণদাস।
মাদ্রাজ	১৯১৪	ভূপেন্দ্রনাথ বসু	সুব্রহ্মণ্য আয়ার।
বোম্বাই	১৯১৫	সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ	দীনশা ইদালজী ওয়াচা
লক্ষ্ণৌ	১৯১৬	অম্বিকাচরণ মজুমদার	পণ্ডিত জগৎনারায়ণ।
কলিকাতা	১৯১৭	মিসেস বেসাণ্ট	বৈকুণ্ঠনাথ সেন।
দিল্লী	১৯১৮	পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য	আজমল খাঁ।
অমৃতসর	১৯১৯	পণ্ডিত মতিলাল নেহরু	স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।
নাগপুর	১৯২০	বিজয়রাঘবাচারিয়া	যমুনালাল বাজাজ।
আমেদাবাদ	১৯২১	আজমল খাঁ	বিঠলভাই পেটেল।
গয়া	১৯২২	চিত্তরঞ্জন দাশ	ব্রজকিশোর প্রসাদ।
কোকনদ	১৯২৩	মহম্মদ আলী	কোণ্ডা বেঙ্কটাপ্পা।
বেলগাঁও	১৯২৪	মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী	গঙ্গাধররাও দেশপাণ্ডে।
কানপুর	১৯২৫	শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু	মুরারীলাল।
গৌহাটী	১৯২৬	শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার	তরুণরাম ফুকন।

কংগ্রেসের অধিবেশন-তালিকা

স্থান	খৃষ্টাব্দ	সভাপতি	অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।
মাদ্রাজ	১৯২৭	ডাক্তার আন্সারী	মথুরঙ্গ মুদেলিয়ার।
কলিকাতা	১৯২৮	পণ্ডিত মতিলাল নেহরু	যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।
লাহোর	১৯২৯	পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু	সৈফুদ্দিন কিচলু।
করাচী	১৯৩১	বল্লবভাই পেটেল	চৈতরাম গিদওয়ানী।
দিল্লী	১৯৩২	শেঠ রণছোড়লাল	
কলিকাতা	১৯৩৩	মিসেস নেলী সেনগুপ্তা	
বোম্বাই	১৯৩৪	রাজেন্দ্র প্রসাদ	কে, এফ, নরীম্যান

কংগ্রেসের অতিরিক্ত অধিবেশন-তালিকা

স্থান	খৃষ্টাব্দ	সভাপতি	অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি
বোম্বাই	১৯১৮	হাসান ইমাম	বিঠলভাই পেটেল।
কলিকাতা	১৯২০	লালা লাজপত রায়	ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী।
দিল্লী	১৯২৩	আবুল কালাম আজাদ	ডাক্তার আন্সারী।

